কিশোর গ্রন্থাবলী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
৩৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

শ্রীমৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅশোক ধর

মুদ্রণ :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা-৬

প্রকাশন :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স,
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

ব্লক তৈরী :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং,
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন মুদ্রণী,
২ কার্তিক বসু রোড,
কলিকাতা-৯
গ্রন্থন :
ব্যানার্জী এণ্ড কোং,
১০১ বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা-৯

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

সূচী ঃ

উপন্যাস ঃ

পুনর্জন্ম ১

গল্প ঃ

প্রাপ্তিযোগ ৪৩
মোনা ডাকাত ৫১
ভূতের গল্প ৬০
সত্যি কথা ৭০
ঝুঁকো বাবুর গোঁফ নেই ৭৮
কিষণলাল ৮৭
সাঁওতাল পল্লী ৯৭

নাটক ঃ

আর এক সিরাজ ১১৭

উপন্যাস

পুনর্জন্ম

এক

আমি বেঁচে আছি। আমি এখনও মরিনি। অথচ তোমরা সবাই জানো—আমি মরে গেছি। খবরের কাগজে আমার মৃত্যু-সংবাদ পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, সেদিন রাত্রে দেখলাম আমার এই আকস্মিক অকাল-মৃত্যুর জন্য বিরাট এক শোকসভা আহ্বান করা হয়েছে। চারিদিকে আলো জ্বলছে, মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বক্তারা একের পর এক বক্তৃতা দিচ্ছেন। বেঁচে থাকতে যারা আমার নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারতো না, আমার নামে নানারকম কুৎসা রটনাই ছিল যাদের একমাত্র কাজ তারাও দেখি আমায় প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে, আর আমি সেই সভারই পেছনের দিকে একটা বেঞ্চির একধারে মুখে চাদর ঢাকা দিয়ে, অচেনা লোকের ভিড়ের মাঝখানটিতে চুপটি করে' বসে।

বেশ মজা। না?

কিন্তু মজা হয়ত' তোমাদের কাছে হতে পারে। আমার কাছে নয়।

বেঁচে থেকে আমি মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করছি। প্রতিটি মুহূর্ত আমার কেমন করে' যে কাটছে তা একমাত্র আমিই জানি।

কেমন করে এ-ঘটনা ঘটলো আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এর পেছনে যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে, আমি না জানিয়ে গেলে তোমরা কেউ জানতে পারবে না।

তাই জানাচ্ছি সেকথা। শোনো।—

দুই

এমন একটা-কিছু বিরাট ঘটনা নয়। মানুষের জীবনে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে থাকে।

আমার মা-বাবার আমি একমাত্র সন্তান। আমার যখন জ্ঞান হলো, দেখলাম—আমাদের মস্ত বাড়ী। বাবা মস্ত বড়লোক। বাড়ীতে লোকজন ঠাসা। বড়লোকের বাড়ীতে যা হয়, আমাদের বাড়ীতেও তাই। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন—যাদের কোথাও কিছু নেই, যারা একটি পয়সা রোজগার করতে পারে না, খায় দায় আর ঘুমোয়, এইরকম সব নিষ্কর্মা লোক, তাদের গুষ্টিবর্গ নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আমাদের বাড়ীতে।

অথচ আপনার বলতে আমরা তিনজন। বাবা, মা আর আমি।

দোতলায় আমাদের শোবার ঘরের পাশেই ছিল ঠাকুরঘর। আগাগোড়া মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়া।

প্রতিদিন সকালে দেখতাম—মা স্নান করে, পিঠে একপিঠ কালোচুল এলিয়ে দিয়ে, লাল চওড়া পাড় গরদের শাড়ী পরে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে বসতেন। উঠে আসতেন আমার খাবার সময়। আমাকে খাইয়ে ইস্কুলে দিয়ে মা কি করতেন জানি না, ইস্কুল থেকে ফিরে এসেই দেখতাম, মা আমার খাবার নিয়ে জানালার কাছটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ধ্যের সময় মা'র আবার সেই পূজারিণীর বেশ! আবার সেই ঠাকুর-ঘর।

আমি আর ঠাকুর! ঠাকুর আর আমি! এছাড়া মা'র যেন এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছু নেই!

বাবা বাইরে-বাইরেই থাকেন। দিনের বেলা তাঁকে একরকম দেখতেই পাই না। হঠাৎ এক-একদিন দেখি, বাবা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকেন, মাকে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যান, কি-সব তাঁদের কথা হয়, তারপর বাবা চলে যান বাইরে, মা আসেন আমার কাছে।

মা-বাবার কথার মধ্যে একটা কথাই আমি মা'র মুখে বার-বার শুনেছি। মা বলছেন বাবাকে, টাকা টাকা করেই কি জীবনটা কাটিয়ে দেবে? টাকার নেশা তোমাকে পেয়ে বসেছে।

বাবা কোনোদিন বলতেন—হ্যাঁ।

আবার কোনোদিন দেখতাম, তিনি হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছেন।

এই নিয়ে একদিন একটা বড় হাসির কথা মাকে আমি জিজ্ঞাসা

করেছিলাম। আমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। কিন্তু কথাটা আমার এখনও মনে আছে।

মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, টাকার নেশা কি মা? টাকা খেলে নেশা হয়?

মা হাসতে হাসতে আমাকে আদর করে' কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন,—ও-সব কথা তুমি এখন বুঝতে পারবে না বাবা। বড় হও, তখন বুঝবে।

বুঝেছিলাম। বড় হয়ে সেকথা আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলাম। কেমন করে' বুঝেছিলাম সেকথা পরে বলছি।

আর-একদিনের আর-একটা কথা।

মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি যে দিনরাত ঠাকুরঘরে বসে থাকো মা, কি বল তোমার ঠাকুরকে?

মা আবার আমাকে তেমনি আদর করে' বলেন, কি আর বলবো বাবা! ঠাকুরের কাছে আমার শুধু একটিমাত্র প্রার্থনা—তুমি যেন তোমার বাবার মত না হও।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন মা, বাবার মত হব না?

—না বাবা। বলেই মা আমার অন্যদিকে তাকালেন। দেখলাম মা'র চোখ দুটি জলে ভরে এসেছে। মাকে আর আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারিনি।

মা আমার কেন যে সেকথা বলেছিলেন, বুঝতে খুব বেশি দেরি অবশ্য হয়নি।

ইস্কুলে আমি বরাবরই খুব ভালো ছেলে। কোনো বছর ফার্স্ট হই, কোনো বছর সেকেণ্ড। সে বছর তখন আমি সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি। বেশ বড় হয়েছি। সব-কিছু বুঝতে শিখেছি।

মা'র সঙ্গে বাবার তখন প্রায়ই ঝগড়া হচ্ছে। ঝগড়ার কারণও বুঝতে পারছি। আমাদের বড়লোকের জৌলুস কেমন যেন কমে আসছে। বাবার মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে। আগেকার মতন এখন আর সব সময় বাইরে বাইরে কাটান না। এখন প্রায়ই দেখি তিনি বাড়ীতেই বসে থাকেন। দু'খানা মোটর ছিল। একখানা বিক্রি করে' দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ ছ' জন চাকর ছিল। এখন মাত্র দু' জন। আত্মীয় পোষ্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা কম হয়ে এসেছে।

আমার এক দূর সম্পর্কের পিসিমা ছিলেন বাড়ীতে। নীচের প্রায় তিন-চারখানা ঘর তিনি আর তাঁর ছেলেমেয়েরা দখল করে' থাকতেন। তাঁর স্বামী ছিলেন হাঁপানীর রুগী। দিবারাত্রি খক্ খক্ করে' কাশতেন আর সবাইকে গালাগালি দিতেন।

তাঁর ছেলেরা ছিল এক-একটি খাঁজা খাঁ নবাব। তিন ছেলে আর দুই মেয়ে। বড় ছেলে আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েই স্কুল ছেড়ে দিলে। বাকি দু'জন তো ইস্কুলের ধার-পাশ

দিয়েও গেল না। বড় মেয়ের বিয়ের নাকি সব ঠিক করে' ফেলেছেন পিসিমা নিজেই। এখন টাকা চাই।

বাবা তাঁর ক্যাশিয়ারকে দু'হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলে দিয়েছেন। কিন্তু দু'হাজার টাকায় মেয়ের বিয়ে হয় না। এই নালিশ নিয়ে পিসিমা এলেন আমার মা'র কাছে।

—যতীনকে তুমি একবার বলে দাও বৌ, তাহ'লেই হবে।

মা বললেন, তুমি জানো না দিদি, তাই একথা বলছো। ওর অবস্থা এখন খুব খারাপ। অনেক টাকা লোকসান হয়ে গেছে। আমরা এখন কি করবো তাই ভাবছি।

কথাটা পিসিমা বিশ্বাস করলেন না। ধরে বসলেন—তোমাকে বলতেই হবে। কন্যাদায় বলে কথা! দিলে পুণ্যি হবে।

মা তাঁকে অনেক করে' বুঝিয়ে বললেন। বললেন, ওইতেই তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে যেমন করে হোক্ পার করে' দাও দিদি, নইলে কোন্ দিন কি হয় বলা যায় না। শেষে হয়ত' এই দু'হাজারও পাবে না।

কিন্তু চিরটা কাল যিনি পরনির্ভর, তিনি তা শুনবেন কেন? রাগ করে' নিলেন না দু'হাজার টাকা। বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে দিবারাত্রি গজ্‌রাতে লাগলেন।

তাঁর টুক্‌রো টুক্‌রো বাক্যবাণ কানে এসে বাজতে লাগলো।—মান-সম্মান রাখতেই যদি না চাইবি তো আমাদের রেখেছিলি কেন?

—কুলিন ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার মত পুণ্যি আর কিছু আছে?

বুড়ো পিসেমশাই নড়তে চড়তে পারেন না। কাশতে কাশতে শ্বাস তলিয়ে যায়, দম নিতে কষ্ট হয়, তবু তিনি বলতে ছাড়েন না। বলেন, টাকার গরমেই ম'লো। আমি যদি একটু সুস্থ থাকতাম তা,হলে একবার দেখিয়ে দিতাম—টাকা কিরকম করে' রোজগার করতে হয়। টাকার টাকায় ধুল-পরিমাণ করে ফেলতাম।

কাশির ধমক আসে। বাধ্য হয়ে তাকে চুপ করতে হয়।

খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করেন, টাকা যদি দিই না কাউকে তো কিসের টাকা! মর্ মর্ শালা, টাকার অহঙ্কারেই মর্!

সম্পর্কটা শালা ভগ্নিপতির তাই রক্ষা। নইলে আমি নিজেই একদিন ওদের তাড়িয়ে দিতাম বাড়ী থেকে।

মাকে বললাম একদিন, 'এইসব নিমকহারাম মানুষগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে' দিলে হয় মা। .

আমার মা বড় নির্বিরোধী মানুষ। বললেন, ওদের কথায় রাগ করিসনে বাবা। ওরা এমনিই হয়। আত্মসম্মানবোধ ওদের নেই। থাকলে এমন করে' পরের বাড়ীতে আজীবন বাস করতে পারে না। যাক্, ঠাকুর যতদিন রেখেছেন, ততদিন থাক্।

রাগ আমার সত্যিই হয়েছিল। বললাম, তুমি বলছো থাক্ কিন্তু নিজেদের এক পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই, অথচ কিরকম অভিশাপ দেয় শুনছো?

আমার কথার জবাব না দিয়ে মা তাঁর ঠাকুর-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি—এই ঠাকুর-ঘরই যেন তাঁর একমাত্র আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মা যা' বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাই সত্য হলো।

পিসিমা তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য দু'হাজার টাকাও পেলেন না। আমাদের সর্বনাশ। বিপদ এসে গেল একেবারে অকস্মাৎ। বিনামেঘে বজ্রপাতের মত।

বাবা যে ভেতরে ভেতরে কি করেছিলেন তিনিই জানেন। দেখতে দেখতে মাত্র দিন-পনেরোর ভেতর আমরা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। টাকা গেল, মা'র গয়নাগাঁটি যা-কিছু ছিল সব গেল, শেষ পর্যন্ত এতবড় বাড়ী--তাও একদিন ছেড়ে দিয়ে আমরা পথে এসে দাঁড়ালাম।

তিন

ভবানীপুরের ছোট্ট একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে আমরা তিনজন গিয়ে উঠলাম। বাবা মা আর আমি।

সেদিন কিন্তু পিসিমার জন্যে সত্যিই আমার কষ্ট হয়েছিল। রুগ্ন পিসে-মশাইকে নিয়ে কলকাতা ছেড়ে তাঁকে যেতে হলো গ্রামে। সেখানে তাঁদের নাকি একখানা বাড়ী আর কিছু জমিজমা এখনও আছে।

আমাদের আবার তাও নেই।

আমার মা কিন্তু সর্বংসহা। নিরাভরণা হৃতসর্বস্বা মা আমার নিজের হাতে রান্না করেন, ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম সবই করতে হয় তাঁকে। মুখে একটি কথা নেই। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই।

বাবা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান লুকিয়ে লুকিয়ে। আবার বাড়ী ঢোকেন সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ ঢেকে। সামান্য যা কিছু আনেন, তাই দিয়েই আমাদের কোনোরকমে চলে যায়।

সে-বছর আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি। পাশ করবো নিশ্চয়ই।

কিন্তু তারপর? কে পড়াবে?

আমার মাকে আমি চিনি। তাই একদিন চুপি চুপি মা'র কাছে গিয়ে বসলাম। ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, মা!

মা মুখ তুলে চাইলেন।

বললাম, যাব একদিন শ্যামবাজারে? মামাবাবুর কাছে?

মা'র সহোদর ভাই। আমার মামা—আনন্দময় চ্যাটার্জি। মস্ত বড় লোক।

মা চুপ করে রইলেন। বললেন, কি জন্যে যাবি বাবা? ভিক্ষে চাইতে?

মা'র দুচোখ ছাপিয়ে জল এলো।

কেন জল এলো আমি জানি।

মাকে আর বেশিকিছু বলতে সাহস হ'লো না। বললেই সেই পুরণো দিনের কথা উঠবে।

এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মা'র জীবনের একটা মস্ত বড় বেদনার ইতিহাস।

সে ইতিহাস আমি শুনেছি। মাই আমাকে বলেছে। বলেছে আর কেঁদেছে।

মা'র তখনও বিয়ে হয়নি। আমার মাতামহ—মার বাবা, রায় মহাশয় উমাশঙ্কর চ্যাটার্জি তখন বেঁচে।

মস্ত বড় ধনী ছিলেন এই রায় বাহাদুর।

সেই রায় বাহাদুরের একমাত্র কন্যা আমার মা।

একটি ছেলে আর একটি মেয়ে।

ছেলের বিয়ে দিয়ে ঘরে বৌ এনেছেন, আর মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন রায় বাহাদুর।

নিজে আর কোথায় খুঁজবেন? দালাল লাগিয়েছেন। ঘটকেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে রায় বাহাদুরের একমাত্র আদরিণী কন্যার জন্য মনের মত একটি পাত্র।

সবাইকে বলে দিয়েছেন—মনের মত ছেলে যদি হয় তো টাকা পয়সার জন্য আটকাবে না। যত টাকা লাগে তিনি দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

এমনি যখন অবস্থা, রায় বাহাদুর একদিন একটী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ী থেকে নামলেন।

ছেলে মানে একটি প্রিয়দর্শন যুবক। ধপ ধপ করছে গায়ের রং, পরণে বিলিতি স্যুট, চোখে সোনার চশমা।

কে এই ছেলে, কোথেকে এলো, কেন এলো জানবার জন্যে ছটপট করতে লাগলো, কিন্তু কি ছেলে কি মেয়ে—বাঘের মত ভয় করে বাপকে, জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না।

মা থাকলেও-বা কথা ছিল, মাকে জিজ্ঞাসা করলেই সব জানা যেতো, কিন্তু রায় বাহাদুরের স্ত্রী মারা গেছেন বছর-দুই আগে।

রায়-বাহাদুরের দু'মহলা বাড়ীর সামনের মহলের দোতলায় সবচেয়ে ভাল ঘরখানা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। একজন চাকরকে বলে দেওয়া হয়েছে তার দেখাশুনা করতে, রান্নাবাড়ীতে বলে দেওয়া হয়েছে—সে যখন যা খেতে চাইবে তার ঘরে যেন তাই পৌছে দেওয়া হয়।

কে বাবা এই রাজপুত্তুর—যার এত যত্ন, এত খাতির?

রাজপুত্তুর কিন্তু নিজেই নিজের পরিচয় দিলে।

রায় বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে হলো তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা।

রায় বাহাদুরের ছেলেই—একদিন তার বোনকে ডেকে বললে, ওরে ও স্মৃতী, ও রাজার ছেলে নয়, বরং ঠিক তার উল্টো। নিতান্ত গরীবের ছেলে। নাম—করুণাময় মুখুজ্যে।

বোন জিজ্ঞাসা করলে, বাবা কোথেকে ওকে কুড়িয়ে আনলে? চাকরি-বাকরি দেবে না কি?

—সে আর কেমন করে' বলবো বল্‌। বাবা জানে।

তারপর ধীরে ধীরে জানা গেল ভেতরের ব্যাপারটা।

রায় বাহাদুর রাণীগঞ্জে গিয়েছিলেন একটি কলিয়ারী কিনতে। কলিয়ারী যিনি বেচবেন, তাঁরই বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন তিনি। সেইখানেই এই ছেলেটির সঙ্গে দেখা। ছেলেটি তাঁর বন্ধুর ছেলে। বন্ধু সিমলাতে

চাকরি করতেন। পুজোর ছুটিতে সপরিবারে আসছিলেন বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে। এলাহাবাদের কাছে হয় ট্রেন-এ্যাক্সিডেণ্ট্। সেই দৈব দুর্ঘটনায় ছেলের মা বাবা আর ছোট ছোট ভাই আর একটি বোন—সবাই একসঙ্গে মারা যায়।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র এই ছেলেটি।

পাটনা থেকে বি-এ পাশ করে সে তখন গিয়েছিল দিল্লীতে একটি চাকরির সন্ধানে। দিল্লী থেকে তারও সেই ট্রেনে রাণীগঞ্জ আসবার কথা। কিন্তু মৃত্যু যার নেই সে আসবে কেন ?

সেই ট্রেনখানা ধরবার জন্যই আসছিল সে দিল্লী স্টেশনে, পথে তার এক সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল। স্টেশনে এসে দেখলে, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধু টেনে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। রাত্রিটা বন্ধুর বাড়ীতে কাটিয়ে পরের দিন রাণীগঞ্জে আসবে, সকালের খবরের কাগজে দেখলে, ট্রেন কলিশনের সংবাদ।

তারপর এলাহাবাদে আসা। মৃতদেহের সৎকার। বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধ। রেল-কোম্পানীর সঙ্গে বোঝাপড়া।

সব-কিছু চুকিয়ে করুণাময় রাণীগঞ্জে তার পিতৃবন্ধুর বাড়ীতে বসে ঠিক করতে পারছিল না, কি করবে সে।

সরকারী চাকরী সে পেতে পারতো, রেল-কোম্পানী চাকরী দিতে চেয়েছিল, কিন্তু চাকরি করবার ইচ্ছা তার নেই। রেল-কোম্পানীর কাছ থেকে অনেকগুলি টাকা সে পাবে। ইচ্ছা, তাই দিয়ে একটা ব্যবসা করবে।

কিন্তু রায় বাহাদুরের সঙ্গে এর সম্পর্কই-বা কি, আর এত আদর-যত্ন করে' বাড়ীতে এনে রাখবার প্রয়োজনটাই-বা কিসের,—সেকথা ভেঙে ফুটে না বলেন রায় বাহাদুর, না বলে করুণাময়।

সৌখীন মানুষ এই করুণাময়। হঠাৎ দেখা গেল রং তুলি নিয়ে ঘরে বসে বসে ছবি আঁকছে। ছবি সে মন্দ আঁকে না। হাতের লেখাটিও চমৎকার।

আনন্দময়ের কিন্তু এ-সব সখ একেবারেই নেই। বলে, ও-সব রাখো। চল তার চেয়ে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

সেদিক দিয়ে আবার করুণাময়ের নিদারুণ বিতৃষ্ণা। বলে, বন্দুক দিয়ে

নিরীহ পাখীগুলোকে মারতে হবে? তুমি মায়োগে যাও, আমি সহ্য করতে পারবো না।

করুণাময় একদিন একটি ক্যামেরা নিয়ে এলো।

ক্যামেরা নিয়ে ক্রমাগত ছবি তুলে বেড়াতে লাগলো।

বাড়ীর অন্দরমহলের সঙ্গে করুণাময়ের কোনও সম্বন্ধই ছিল না। এই ক্যামেরাই হলো তার যোগসূত্র।

রায় বাহাদুর সেদিন বাড়ীতে ছিলেন না। আনন্দময় তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে আর বোনকে বললে, এসো। ছবি তোলাতে হবে।

প্রথমে যেতে চায়নি কেউ। আনন্দময় রাগ করলে। বললে, আমার খাবারটা আজ থেকে বার-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও।

বাধ্য হয়ে তখন যেতে হলো।

ছবি তোলা হলো। চমৎকার ছবি।

রায় বাহাদুর দেখলেন সে-ছবি। দেখে হাসলেন একটুখানি।

রেল-কোম্পানীর টাকাটা পেলে করুণাময়।

আর এই টাকা পাওয়ার কিছুদিন পরেই সব-কিছু জানতে পারা গেল। জানতে পারা গেল রায় বাহাদুরের মনোভাব।

রায় বাহাদুরের অন্দরমহলে করুণাময়ের প্রবেশাধিকার চিরদিনের জন্য পাকা করে দিলেন তিনি। ভাল একটি দিন দেখে তাঁর একমাত্র কন্যার সঙ্গে করুণাময়ের বিবাহ চুকিয়ে ফেললেন।

করুণাময় হলো রায় বাহাদুরের জামাই।

মেয়ে-জামাইএর ভাল একটা ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন—এই ছিল রায় বাহাদুরের ইচ্ছা।

কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা সব সময় পূর্ণ হয় না।

কোনও কিছু না করেই রায় বাহাদুর একদিন মারা গেলেন অকস্মাৎ। একটা উইল পর্যন্ত করবার অবসর পেলেন না।

আনন্দময় বললে, বাবা না করুন, আমি দেবো।

এই বলে করুণাময়কে ডেকে একদিন সে জিজ্ঞাসা করলে, কি করতে চাও তুমি?

করুণাময় বললে, ব্যবসা।

—কত টাকা চাই ?

—আপাততঃ হাজার-পাঁচেক।

তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার টাকার একটি চেক লিখে দিলে আনন্দময়।

ব্যবসা করুণাময় করলে না। শেয়ার মার্কেটে ফট্‌কা খেলতে লাগলো। শেয়ার মার্কেট আর রেস কোর্স।

একখানা গাড়ী কিনে ফেললে একদিন।

আনন্দময় জিজ্ঞাসা করলে, গাড়ী তো একখানা রয়েছে বাড়ীতে, আবার কিনলে কেন ?

করুণাময় বললে, বাড়ীর গাড়ী দিয়ে আমার কাজ চলে না।

আনন্দময় বললে, তাহ'লে ভাল রোজগার হচ্ছে বল !

করুণাময় বললে, মন্দ কি !

কিছুদিন পরে গাড়ীখানা দিলে বিক্রি করে।

আনন্দময়ের সন্দেহ হলো। বললে, রেল-কোম্পানীর টাকাগুলো কি করেছ ?

—সব লাগিয়ে দিয়েছি।

এমনি করে' টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চললো পাঁচটি বছর ধরে'।

তারপর অকস্মাৎ একদিন হ'লো তার অবসান।

অবসান হলো নিতান্ত মর্মান্তিক ভাবে।

যা না হওয়াই হয়ত উচিত ছিল।

কিছুদিন ধরে আনন্দময় আর করুণাময়ের ভেতর কেমন যেন গোলমাল চলছিল। তাদের ঘনিষ্ঠতার কোথায় যেন চিড় খেয়েছে।

ব্যাঙ্কের পাশ-বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে আনন্দময়। কি একটা ব্যাপারের মীমাংসা যেন কিছুতেই করতে পারছে না।

করুণাময়কে কাছে ডেকে বললে, শোনো।

ব্যাঙ্কের পাশ-বইটা দেখিয়ে আনন্দময় বললে, ছাখো, সবগুলোই ঠিক মিলে গেছে, কিন্তু এই পাঁচহাজার টাকা তোমাকে আমি দিয়েছি বলে তো মনে হচ্ছে না। কখন দিলাম।

করুণাময় বললে, যে তারিখে লেখা সেই তারিখেই দিয়েছ।

আনন্দময় বললে, নাঃ, দিইনি।

—দাওনি তো দাওনি। বলেই করুণাময় চলে যাচ্ছিল সেখান থেকে।

আনন্দময় যেতে দিলে না। বললে, শোনো শোনো, পালিও না!

ফিরে দাঁড়ালো করুণাময়। কি শুনবো?

—আমি দিলাম না, অথচ তুমি পেলে কেমন করে' আমাকে বুঝিয়ে দাও।

করুণাময় হাসলে একটু ম্লান হাসি। বললে, নিজে আগে বুঝবার চেষ্টা কর। বুঝতে যখন পারবে না তখন বুঝিয়ে দেবো।

আনন্দময় বললে, অনেক চেষ্টা করলাম। বুঝতে কিছুতেই পারছি না।

করুণাময় এবার ভাল করে' চেপে বসলো। বললে, আমাকে অনেক টাকাই তুমি দিয়েছ। অবশ্য তোমার বাবা যা দেবেন ভেবেছিলেন তার একটা ভগ্নাংশও তুমি দাওনি। না দিলেও আমার কোনও দুঃখ নেই।

আনন্দময়ের গলায় কেমন যেন অন্য সুর বেজে উঠলো। বললে, আমার বাবা তোমাকে কত দিতেন বলে তোমার মনে হয়?

করুণাময় বললে, যদি বলি তাঁর যা ছিল তার অর্ধেক।

—মেয়েকে কেউ কখনও অর্ধেক দেয় না।

—দেয় না—অন্যায় করে। সে অন্যায় তোমার বাবা হয়ত নাও করতে পারতেন। যাক্‌গে। তার জন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই। তুমি জিজ্ঞাসা করলে বলেই বলছি। নইলে জীবনে কোনদিন আমি ও কথা উচ্চারণ করতাম না।

আনন্দময় বললে, তাহ'লে তোমার বিশ্বাস, আমি তোমাকে বঞ্চিত করেছি?

করুণাময় বললে, আমাকে বঞ্চিত করবার ক্ষমতা কারও নেই। আমি জানি—আমার যতটুকু পাবার অধিকার, এ পৃথিবী আমাকে ঠিক ততটুকুই দেবে, তার বেশি আমি পাব না। টাকার ওপর এতটুকু মমতা আমার নেই। আমি জানি, টাকার দাম আমার কাছে তখনই—যখন আমার টাকার প্রয়োজন।

আনন্দময় একটু জোরেজোরেই বললে, থামো। তোমার ও বড় বড় কথা আমি শুনতে চাই না, ওই পাঁচ হাজার টাকাটার কি ব্যাপার, তাই বল!

—আমি তো বলছি, আমি পেয়েছি। বাস, ফুরিয়ে গেল।

—না, ফুরিয়ে যায়নি।

—তাহ'লে তুমি কি বলতে চাও, ও-টাকাটা আমাকে তোমার দেবার ইচ্ছা ছিল না? তোমার তো অনেক অনেক আছে, দিলেই-বা আমাকে আরও পাঁচ হাজার।

অনেক রকম করে' আনন্দময়কে বোঝাবার চেষ্টা করলে করুণাময়, আনন্দময় সেই এক কথা ধ'রে রইলো।

—কেমন করে' পেলে, তাই বল।

—তুমি দিয়েছ, আমি পেয়েছি।

—না আমি দিই নি। বেশ জোর গলায় বললে আনন্দময়।

—তাহ'লে আমার আর কিছু বলবার নেই। বলেই করুণাময় চলে গেল সেখান থেকে।

কথাটার মীমাংসা ঠিক হলো না। আনন্দময়ের মনে সন্দেহ জেগে রইলো।

সে তার বোনকে ডেকে বললে, করুণাময় সব টাকাগুলো উড়িয়েছে। জানিস?

—আমি আর জেনে কি করবো দাদা?

আনন্দময় বললে, না না, তোকে জানতে হবে। করুণাময় আমার সই জাল ক'রে ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ হাজার টাকা তুলে নিয়েছে।

কথাটা শোনবামাত্র সুশীলার মাথাটা ঘুরে গেল। সর্বশরীর থর্ থর্ করে' কাঁপতে লাগলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে চোখের জলটা বন্ধ করবার চেষ্টা করলো। কিছুতেই যখন পারলে না, তখন সেখান থেকে ছুটে পালালো।

স্ত্রীর মুখে সব কথা শুনে করুণাময় এলো আনন্দময়ের কাছে।

বেশ একটু রাগ করেই বললে, আমি তোমার সই জাল করেছি?

আনন্দময় স্পষ্ট পরিষ্কার জবাব দিলে, তা না'হলে ব্যাঙ্ক টাকা তোমাকে দিলে কি করে?

—তোমার চেক পেলাম কোথায়?

—আমার চেক কোথায় থাকে, তুমি জানো।

করুণাময় বললে, যদি বলি, তোমার সই-করা একখানা চেক ছিল, আমি সেই পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে আমার নামটা লিখে নিয়েছি শুধু। তোমার কাছ থেকে বার বার টাকা চাইতে আমার লজ্জা হয়েছিল।

আনন্দময় বললে, না, সই-করা চেক আমি ফেলে রাখিনি।

করুণাময় বললে, তাহ'লে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি চেক জাল করেছি এমন নিখুঁত জাল আমি করতে পারি?

আনন্দময় বললে, তুমি সব পারো।

করুণাময় বললে, এ-কথাটা তোমার বোনকে না বলে আমাকে বলা উচিত ছিল।

আনন্দময় আর কথা বললে না, চুপ করে' রইলো।

করুণাময় বললে, ভাল, তাহ'লে আর আমার এখানে থাকা চলে না।

সে কথারও কোনও জবাব দিলে না আনন্দময়।

এইখানেই সব শেষ হয়ে গেল।

আমার বয়স তখন তিন বছর।

বাবা গাড়ী নিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আর কিছুতে থাকবেন না এ-বাড়ীতে।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে আমার মা গিয়ে দাঁড়ালেন মামাবাবুর কাছে।

মামা মুখ তুলে তাকাতেই মা গড় হয়ে তাঁকে একটি প্রণাম করলেন।

মামাবাবু প্রথমে বুঝতে পারেননি, বললেন, কিরে, তুই কোথায় যাবি?

মা বললেন, আমাকে আর থাকতে বোলো না দাদা! যাই করে থাকুন, উনি আমার—

মার গলাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চোখের জল মুছতে মুছতে আমার হাত ধরে মা বেরিয়ে এসেছিলেন।

এই গল্পটি মা আমাকে অন্য রকম করে বলেছেন।

সে আজ অনেকদিনের কথা।

এমনি করেই মামাবাবুর সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে জানি। তবু আমি মাকে সেদিন বললাম, সেই পুরণো কথা আজও কি মনে করে' রাখতে হবে মা?

মা বললেন, তাছাড়া উপায় বাবা, তোমার বাবার যে এতে মাথা হেঁট হয়ে যাবে!

সেকথাও সত্যি। তবে কাজ নেই আমার লেখাপড়ায়।

ভাবলাম, টাকা-পয়সার অভাবে পড়া যদি আমার বন্ধ হয়ে যায় তো

যাক্। যেখান থেকে হোক্, যেমন করে' হোক্, কিছু রোজগার করবার চেষ্টা করবো। করে' বাবাকে বলবো—আপনি বসে থাকুন।

কিন্তু এমনি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, বলতে হলো না।

আমার পরীক্ষার খবর তখনও বেরোয়নি। বাবা সেদিন দুপুরে বাড়ী ফিরে এসেই শুয়ে পড়লেন।

আমাদের যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকুও হয়ে গেল।

তিনদিনও তাঁকে শুয়ে থাকতে হলো না। বুকের অসহ্য যন্ত্রণায় সেদিন রাত্রে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সারারাত আমরা তাঁর শিয়রের কাছটিতে চুপ করে' বসে। মা আর আমি।

এত বড় একটা মানুষ—যাঁর অর্থ-সম্পদের অন্ত ছিল না, আজ তাঁর চিকিৎসা করবার জন্য ডাক্তার এলো না।

এ যে কত বড় যন্ত্রণা—যারা ভুক্তভোগী নয় তারা বুঝবে না। রোগ যিনি ভোগ করেছেন, তাঁর চেয়েও নিতান্ত অসহায়ের মত যারা চুপ করে বসে বসে দেখছে আর এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে, তাদের যন্ত্রণাই যেন বেশি।

ডাক্তারের প্রয়োজনও আর হলো না! রাত্রি প্রভাত হবার আগেই তাঁর সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হয়ে গেল।

মা আর চুপ করে' থাকতে পারলেন না। জীবনে এই প্রথম আমি আমার মাকে এমন প্রাণ খুলে কাঁদতে দেখলাম।

মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে।

ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। টাকা চাই। লোক চাই।

কি করবো ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। হঠাৎ নজরে পড়লো আমার পড়ার বইগুলোর দিকে।

মা দেখতে পেলেন না। বইগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ী থেকে।

চার

আমাদের ক্লাসের একটি ছেলেকে একদিন দেখেছিলাম, পুরোণো বই বিক্রী করতে। বইগুলো নিয়ে গেলাম সেই দোকানে। দোকানের সুমুখে দাঁড়িয়ে কি বলব তাই ভাবছি। যদি বিশ্বাস না করে! যদি বলে, এ বই তুমি চুরি ক'রে এনেছো! কী জবাব দেবো!

কিন্তু এমন করে দাঁড়িয়ে ভাবলে তো চলবে না! ঢুকে পড়লাম দোকানে।

দোকানী জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

হাতের বইগুলি তার দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। বইগুলি নিয়ে সে উল্টে পাল্টে দেখলো। দেখেই তাচ্ছিল্যের ভরে নাবিয়ে দিয়ে বললে, দু' টাকা দিতে পারি।

পনেরো কুড়ি টাকার বই, দু' টাকা দেবে? আর দু' টাকায় আমার হ'বেই বা কি?

দোকানী বললে, বসে ভাবছো কি? প্রত্যেকটি বই-এ নিজের নাম, ঠিকানা লিখে দাও।

না, দু'টাকায় দেবো না। বইগুলো হাতে নিয়ে উঠে পড়লাম।

কিন্তু যাবোই বা কোথায়! পুরোনো বই-এর দোকান তো ঐ একটিই এখানে!

ফুটপাত ধরে বাড়ীর দিকে চলেছি।

নাঃ, বাড়ীই বা যাবো কেমন করে। আবার ফিরে গেলাম দোকানে। বললাম, কিছু বেশী দিতে পারেন? আমি খুব বিপদে পড়েছি।

দোকানী আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বললে, চুরি করা বই, এর বেশী দাম দেওয়া যায় না।

চুরি করা নয়, একে বোঝাই কেমন ক'রে? তবু বললাম,—আজ্ঞে না, এ আমার নিজের বই।

মুখ দেখে মনে হ'ল কথাটা সে বিশ্বাস করলো না। বললে—ওরকম সবাই বলে। নাও, আড়াই টাকা দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

এই বলে সে আমাকে ভাববার অবসর পর্যন্ত না দিয়ে হাত বাক্স থেকে আড়াইটি টাকা বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে বললে, যাও।

আড়াইটি টাকা হাতে নিয়ে বাড়ী ফিরছি।

মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার লোক চাই, সেখানকার খরচ চাই। আরও কি কি চাই, কিছুই জানি না।

হঠাৎ মনে পড়লো, ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই।

পথের ধারেই বেশ বড় একটি ডাক্তারখানা। ঢুকে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তারবাবু আছেন?

কাউন্টারে যিনি বসেছিলেন তিনি বললেন, কোন্ ডাক্তার?

নাম জানি না, বললাম—এখানে যিনি বসেন!

—এখানে তিনজন ডাক্তার বসেন। কাকে চাও তুমি?

—যাকে হোক।

—পাশের গলিতে—ঢুকেই ডান দিকে যে বাড়ী পাবে—সেই বাড়ীর দরজায় কড়া নেড়ে ডাকো।

গেলাম সেই বাড়ীতে। কড়া নাড়তেই একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দিলে।

জিজ্ঞেস করলে, কাকে চাই?

বললাম, ডাক্তারবাবুকে।

মেয়েটি বললে, দাদা কলে বেরিয়েছে। ফিরতে রাত হ'বে।

চলে এলাম সেখান থেকে।

পথ চলতে চলতে অন্যসময় কত ডাক্তারখানা দেখেছি। এখন একটাও নজরে পড়ছে না।

তবু এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চললাম। বিপদের দিনে ভগবানের কথা মনে পড়ে। ডাকলাম ভগবানকে। সত্যিই যদি থাকো, আমার এই বিপদের দিনে আমাকে একটু সাহায্য কর।

আমাদের বাড়ীর পাশেই একজন ডাক্তার থাকেন জানি। নিতান্ত সাধাসিধে ডাক্তার। না আছে গাড়ী, না আছে কিছু। শার্ট পাঞ্জাবী ছাড়া তাঁকে কোনদিন কিছু পরতে দেখিনি। খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলেন। স্কুলে যাবার পথে একদিন একটি ছেলেকে খুব বকছিলেন, শুনেছিলাম। ছেলেটার অপরাধ, সে নাকি না দেখে পথ চলছিলো। একটি গাড়ী আর একটু হ'লেই ছেলেটাকে চাপা দিতো। চাপা কিন্তু দেয়নি। তবু তাঁর সে কী তিরস্কার!

যাব তাঁর কাছে?

আমাকেও যদি যেমনি ধমকি দিয়ে বিদেয় ক'রে দেন?

লোকটা বদ্‌রাগী। তা হোক, তবু যাই।

গেলাম। দেখলাম, সুমুখের ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাঙা একটা চায়ের কাপে চা খাচ্ছেন। আমার দিকে নজর পড়তেই জিজ্ঞেস করলেন, কার অসুখ? কী অসুখ?

জবাব দিতে গিয়েও হঠাৎ কেন যেন চোখ দু'টো আমার জলে ভরে এলো, অসুখ না। মরে গেছে।

চায়ের কাপটা তিনি নামিয়ে রাখলেন। বললেন, তা হ'লে আমি গিয়ে কী আর করবো? মরা মানুষকে বাঁচাতে পারি না। যাও, বাড়ী যাও।

একটি মেয়ে ঘরে ঢুকলো। চায়ের কাপটা বোধ করি নেবার জন্যেই এসেছিলো সে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললে, এ কি বলছে বাবা?

ডাক্তারবাবু বললেন, ওকেই জিজ্ঞেস কর। রুগী মরবার পর আমাকে ডাকতে এসেছে।

[illegible] না। আমায় হাতে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। আমার মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে খোকা? কে মারা গেছে?
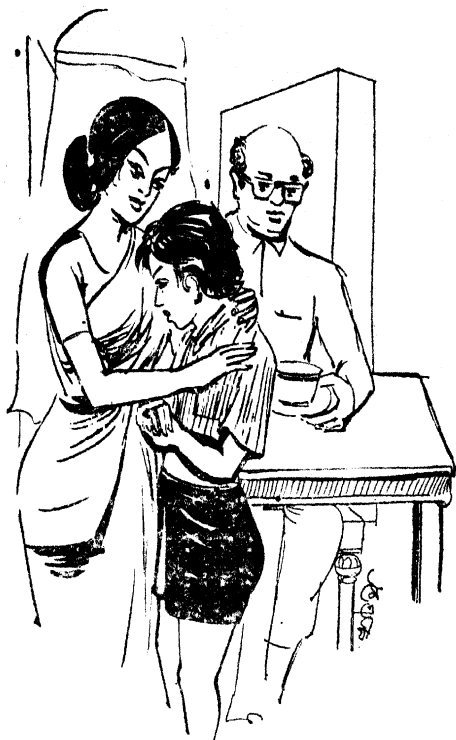
আমার বাবা।

কথাটা বলতে গিয়েও আমার ঠোঁট কাঁপলো, গলাটা যেন বন্ধ হ'য়ে গেল।

—তাহ'লে কি জন্যে এসেছো?

বললাম, শ্মশানে নিয়ে যেতে হ'লে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দরকার হয় শুনেছি। আমার বাবাকে ডাক্তার দেখাতে পারিনি।

এবার আমি ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছিলাম, আমার বেশ মনে আছে। আমার কান্না দেখে মেয়েটি আমাকে আদর ক'রে কাছে টেনে

নিয়ে বসালো। একটি একটি ক'রে সব কথাই জিজ্ঞেস করলে। আমি জবাব দিলাম।

মেয়েটি আমাকে সেইখানে বসিয়ে রেখে পাশের ঘরে গেল। কি বললে তার বাবাকে, জানি না। শুধু এইটুকুই জানি, তাঁরা যদি সেদিন আমাকে দয়া না করতেন, আমার বাবার মৃতদেহের সৎকার হ'তো না।

এমন মানুষও আছে পৃথিবীতে! এত দয়াও থাকে মানুষের হৃদয়ে!

ডাক্তারবাবু আমাকে কিছুই করতে দিলেন না। সবই তিনি নিজে করলেন। এ যেন তাঁরই দায়!

অদৃষ্টে আমাদের উপবাস ছিল অনিবার্য। কিন্তু কেমন করে কি যে হয়ে গেল কে জানে! কে পাঠালে এই ডাক্তারবাবুটিকে? কে বাঁচালে আমাদের এমন করে?

চোখ তো আমাদের জলে ভরেই ছিল, ডাক্তারবাবুকে দেখলে সে জল যেন উপ্‌চে গড়িয়ে আসতো দু' চোখ বেয়ে।

এমন দিনে আমার পরীক্ষার খবর বেরুলো। পাশ তো করেইছি, এমন-কি প্রথম দশ জনের মধ্যে হয়েছি একজন।

চেষ্টা করলে কলেজে বেতন লাগবে না জানি, কিন্তু আমি যদি পড়া নিয়ে থাকি, দু'বেলা অন্নের ব্যবস্থা কে করবে?

ডাক্তারবাবু এলেন। হাতে ধরে টেনে তুললেন আমাকে। বললেন, আয় আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—কলেজে।

মাথা হেঁট করে' দাঁড়িয়েছিলাম।

মা ছুটে এসে বললেন, না।

—না?

আমরা দুজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম মা'র মুখের দিকে।

মা বললেন ডাক্তারবাবুকে—ছেলেকে পড়াতে কার না ইচ্ছে হয় বাবা! কিন্তু তাহলে আমাকে কারও বাড়ীতে একটা কাজ ঠিক করে দিতে হবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, আমাকে তুই এত বোকা ভাবিস কেন বল্ তো?

সব ঠিক করেছি। এ-বাড়ীটাও তো আজ ছেড়ে দিতে হবে। ভাড়া দিবি কেমন করে?

—কোথায় যাব?

ডাক্তারবাবু বললেন, যে-বাড়ীতে ঝি'র কাজ করবি সেই বাড়ীতে। ভারি তো খরচ, একটা বিধবা মা আর একটা ছেলে। একখানা ছোট ঘর হলেই যথেষ্ট। চল্ চল্ আর দেরি করিসনি বাপু। আমার কাজ আছে।

কথাটা তিনি মিথ্যা বলেননি! সবই ঠিক করেছেন। আর সেটি আর কোথাও নয়, তাঁর নিজের বাড়ীতে।

দোতলার একখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললেন আমাদের, বললেন, কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। ঝির কাজ করতে হয়, এইখানেই কর।

পাঁচ

বেশ আছি আমরা।

এখন আর সে দুঃখের কথা আমাদের মনে নেই। এত তাড়াতাড়ি যে এমন করে' সে কষ্টের কথা ভুলে যাব তা ভাবতে পারিনি।

ভুলিয়ে দিয়েছেন ডাক্তারবাবু।

এমন আপন-ভোলা অদ্ভুত মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।

সংসারে তাঁর নিজের বলতে মাত্র ওই এক বিধবা মেয়ে। তার ওপর এখন আমরা জুটেছি। প্রথম প্রথম মনে হতো পরের বাড়ী। কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করতাম। কিন্তু যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে।

প্রথম দিন ডাক্তারবাবুর মেয়েকে আমি 'দিদি' বলে ডেকেছিলাম। ডাক্তারবাবু শুনতে পেয়েছিলেন। শুনতে পেয়েই আমাকে ডাকলেন। বললেন, দিদি বলছিস কাকে?

আমার মা এসে দাঁড়িয়েছিল। বললে, অবলাকে বলছে বোধহয়।

ডাক্তারবাবু বললেন, না না দিদি নয়। আমার একটা মেয়ে ছিল, এখন দুটো হয়েছে। অচলা তোর দিদি নয়, অচলা তোর মাসি।

— বেশ তাহ'লে আজ থেকে 'মাসি' বলেই ডাকবো।

সেই থেকে মা আর মাসিমা দুই সহোদর বোনের মতই বাস করছে এখানে।

ডাক্তারবাবু সেদিন কোথায় যেন 'কলে' গিয়েছিলেন। ফিরতে রাত হয়েছে। আমরা সবাই জেগে আছি। আমাকে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। মাও খায়নি, মাসিমাও খায়নি। মাসিমা গল্প বলছিল। ভূতের গল্প।

গল্প বলছে আর সরে সরে বসছে। সরে বসছে কেন প্রথমে বুঝতে পারিনি।

এমন সময় নীচের সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম।

মাসিমা বললে, বাবা এসেছে।

বলেই দোর খুলে দেবার জন্যে উঠলো। উঠেই আমাকে বললে, আয় তো বিনু আমার সঙ্গে।

এতক্ষণে বুঝলাম ভূতের গল্প বলতে বলতে খোলা জানালার কাছ থেকে তার সরে বসবার হেতু। বললাম, একা যেতে ভয় করছে বুঝি?

মাসিমা বললে, ধেৎ!

—ধেৎ নয়, আমি বুঝতে পেরেছি, ভূতকে তুমি ভয় কর।

মাসিমা বললে, না না, ভূত আছে নাকি যে ভূতকে ভয় করবো? দিদি, তুমি এসো তো।

—বুঝেছি, চল্।

মা তার সঙ্গে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো।

আমি বললাম, কাউকে যেতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

এই বলে আমি নিজে গিয়ে দোর খুলে দিলাম।

ডাক্তারবাবু এলেন। এসেই বললেন, বাড়ীটা এত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে কেন রে?

তাঁর কথাটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। তিনি বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, আগে অবলা একা থাকতো বাড়ীতে। কথা বলবার লোক পেতো না, বেচারা মুখ বুজে পড়ে থাকতো চুপটি করে। এখন তোরা তিনজন রয়েছিস, একটু চেঁচামেচি কর্, গোলমাল কর্, ঝগড়া-ঝাঁটি কর্, তা না এখনও সব চুপচাপ!

সেদিন থেকে গোলমালের ব্যবস্থা আমিই করলাম। মাসিমার ভূতের ভয়ের কথা বুঝতে পেরেছি। অথচ কিছুতেই তাকে স্বীকার করাতে পারছি না।

পরের দিন নীচের রান্নাঘরে মাসিমা একা কি যেন কাজ করছিল।

মা দোতলায়। ডাক্তারবাবু তাঁর নিজের ঘরে। রান্না ঘরের আলোর সুইচ্‌টা ছিল বাইরের বারান্দায়। আমি চুপিচুপি গিয়ে সুইচ্‌টা দিলাম তুলে। রান্নাঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল।

ঐ অন্ধকার হওয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে মাসিমার চীৎকার! দিদি! দিদি!

অন্ধকার বারান্দার একপাশে গা ঢাকা দিয়ে আমি তখন হাসি কিছুতেই চাপতে পারছি না!

দিদি! দিদি! বলে চীৎকার করতে করতে মাসিমা ছুটে বেরিয়ে এলো রান্নাঘর থেকে।

দোতলা থেকে মা বললে, কিরে, কি হলো?

বারান্দাটাও অন্ধকার। মাসিমা সেখানেই বা একা দাঁড়িয়ে থাকে কেমন করে! ছুটে গিয়ে যে সুইচটা জ্বালাবে সে সাহসও নেই। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চেঁচাতে লাগলো, তাড়াতাড়ি একবার নেমে এসো। আলোটা নিবে গেল কেন বুঝতে পারছি না।

মাসিমার গলার আওয়াজ তখন কাঁপছে।

মা বোধকরি বুঝতে পেরেছে। দুর দুর ক'রে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, যাচ্ছি, যাচ্ছি, বিনু কোথায়?

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে।—কি হলো?

ফট্ করে' আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে বললাম, হয়নি কিছুই। কাল আপনি গোলমাল করবার কথা বললেন কিনা, তাই একটু গোলমাল করলাম।

মাসিমা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো।—ওরে দুষ্টু, তুই!

বললাম, হ্যাঁ আমি। এখন বল সত্যি কথা!

মাসিমা বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি। তোর মত অত সাহস আমার নেই।

ডাক্তারবাবু হো হো করে হাসতে লাগলেন।

মার মুখে কিন্তু হাসি দেখলাম না। মা উল্‌টে আমাকে তিরস্কার করলে। বললে, ছি, এরকম করে মানুষকে ভয় কোনোদিন দেখাস্‌নে।

এমনি করে হাসিতে আনন্দে দুটি বছর কেটে গেল ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে।

একটি দিনের জন্য মনে হয়নি সেটা আমাদের নিজের বাড়ী নয়।

আই-এস্‌-সি পাশ করলাম।

মাসিমা অনেকদিন থেকে বলছে—তোর মাকে আর আমাকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে চল বিনু।

সেদিন রবিবার। বললাম, চল।

দক্ষিণেশ্বর-মন্দির থেকে বেরুচ্ছি, দোরের কাছে নাম ধরে ডাক শুনে মা আমার পেছন ফিরে তাকাতেই দেখেন, মামাবাবু।

কতদিন পরে দেখা দুই ভাই-বোনে।

মা হেঁট হয়ে প্রণাম করলে মামাবাবুকে, মামীমাকে। আমিও প্রণাম করলাম।

আমাকে কাছে টেনে নিয়ে মামাবাবু বললেন, তা একেও তো পাঠাতে পারতিস মাঝে মাঝে।—কিরে, পড়াশুনা হচ্ছে, না, বাপের মত—।

মা বললেন, আই-এস্-সিতে থার্ড হয়েছে এ'বছর।

মামাবাবু আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। নিতান্ত আপনজনের সে স্নেহমাখা দৃষ্টি—মনে হলো যেন কতকালের চেনা!

—তোকে যে এ-অবস্থায় দেখবো তা আমি ভাবতে পারিনি সুশী। বলতে বলতে মামাবাবু মন্দিরের সিঁড়ির ওপর বসে পড়লেন। চোখ দুটো তাঁর জলে ভরে এসেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন।

মামীমা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এতক্ষণে কথা বললেন, তা এখানে আবার বসলে কেন?

মামীমার মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন বলতে গিয়েও মামাবাবু বলতে পারলেন না। ঠোঁট দুটো তাঁর থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো। চোখ দিয়ে আবার দর্ দর্ করে জল গড়িয়ে এলো।

আমার মাও আর থাকতে পারলেন না। আঁচলে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন মামাবাবুর পাশেই।

মাসিমার কাছে এসে দাঁড়ালেন মামীমা। বললেন, থাক্ ওরা দু' ভাই বোন। এসো আমরা কথা বলি।

তাঁরা দু'জনেই সরে গেলেন সেখান থেকে একটু দূরে।

মামাবাবু একটু সামলে নিয়ে বললেন, টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি কিরকম রেখে গেছে? দেখাশোনা করছে কে?

মা এইবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, ও-সব কথা জিজ্ঞাসা কোরো না দাদা।

—কেন? দিয়ে গেছে শেষ করে?

—হাঁ।

—বাড়ীটায় কি ভাড়া বসিয়েছিস ?

—বাড়ী নেই।

—বাড়ীটাও গেছে ? এত এত টাকা, অতবড় বাড়ী···

মা বললেন, মরবার সময় ডাক্তার ডাকতে পারিনি। ভবানীপুরে ছোট্ট একটি ভাড়া বাড়ীতে উনি মারা গেছেন।

মামাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, বিধবা ও মেয়েটি কে ?

মা জবাব দিতে পারছিলেন না। গলাটা তাঁর বন্ধ হয়ে এসেছিল।

আমিই বললাম, ওদেরই বাড়ীতে আছি আমরা। ওঁর বাবার দয়ায়—

মামাবাবু কথাটা আমাকে শেষ করতে দিলেন না। বললেন, তবু আসিসনি আমার কাছে ?

মা'র দুচোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

মামাবাবু বললেন, বেশ করেছিস্। আয়। ওঠ্। কোথায় গো তোমরা ? এসো।

মামাবাবুর প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়িয়েছিল মন্দিরের বাইরে। আমরা সবাই উঠলাম সেই গাড়ীতে।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো মামাবাবুর বাড়ীর ফটকে। প্রকাণ্ড রাজার বাড়ীর মত বাড়ী। মা'র মুখে শুনেছি—আমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল এই বাড়ীতে। তারপর এই এলাম।

মাসিমাকেও ছাড়লেন না মামাবাবু। আমাকে শুধু বললেন, এই গাড়ী নিয়ে তুমি চলে যাও ডাক্তারবাবুর বাড়ী। ডাক্তারবাবুকে এখানে ধরে নিয়ে এসো।

ডাক্তারবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে আমাকে একা ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই একা ফিরে এলি যে ? ওরা কোথায় ?

বললাম, আপনাকে আসতে হবে আমার সঙ্গে।

কথাটা শুনে ডাক্তারবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, কেন রে ? রাস্তায় কিছু বিপদ-আপদ হ'লো নাকি ?

হেসে বললাম, না।

আমার হাসি দেখে বোধকরি আশ্বস্ত হলেন তিনি। বললেন, কে

বাপু, আসল কথাটা খুলে বল তাড়াতাড়ি। ওরা রইলোই বা কোথায়, আর আমাকে যেতেই-বা হবে কেন?

বললাম, একটা কথা আপনি বোধ হয় জানেন না—

—আরে বাবা, আমি আর কি জানি বল্। আমি তো অনেক কিছুই জানি না।

এই বলে ডাক্তারবাবু বললেন, বোস্। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবি নাকি?

বসলাম। বসে বললাম, আমার এক মামা আছেন শ্যামবাজারে। মস্ত বড়লোক।

ডাক্তারবাবু লাফিয়ে উঠলেন যেন। বললেন, সে কি রে? বড় লোক মামার ভাগ্‌নে তুই? আমি তো ভেবেছিলাম, তোদের তিন কুলে কেউ কোথাও নেই! তারপর কি হলো বল! সেই মামার সঙ্গে দেখা হয়েছে, এই তো?

বললাম, হ্যাঁ। আমার বাবার সঙ্গে মামার ঝগড়া হয়েছিল, তাই আমরা কেউ কোনদিন সেখানে যেতাম না।

ডাক্তারবাবু বললেন, বুঝেছি বুঝেছি, আর বলতে হবে না। ভাই বোনে দেখা হয়ে গেছে। বাস্, ঝগড়া গেছে মিটে, এই তো?

বললাম, হাঁ তাই।

ডাক্তারবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, তাহ'লে আমার বুদ্ধি আছে বল্? আমি ধরে ফেলেছি ঠিক।

বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এখন আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে বললেন আমার মামা।

ডাক্তারবাবু বললেন, বলবেন। নিশ্চয়ই বলবেন। আমি তোমাদের দু'দিন খেতে দিয়েছি যে! এখন আমার প্রাপ্য আছে তোমার মামার কাছে। ধন্যবাদ দেবেন আমাকে। সেই ধন্যবাদ নিতে যাওয়া—এই তো?

—তা জানি না।

—তুই না জানিলে কি হবে। আমি জানি। কিন্তু ছাখ্ বিনু, এই ধন্যবাদ-টন্যবাদগুলো নিতে আমার ইচ্ছে করে না। আমার না গেলে হয় না?

বললাম, না, আপনাকে যেতেই হবে। আমি গাড়ী নিয়ে এসেছি।

—তা'হলে তো যেতেই হয়! চল।

ডাক্তারবাবু এলেন আমার সঙ্গে।

মামাবাবুর সঙ্গে আলাপ জমাতে তাঁর আর কতক্ষণ!

মাকে বললেন, ওরে হতভাগা মেয়ে—একথা আমাকে একটিবার বললেই তো পারতিস!

মামাবাবু বললেন, লজ্জায়।

ডাক্তারবাবু বললেন, লজ্জা! লজ্জা কিসের মা? বিষয়-সম্পত্তি আজ আছে, কাল নেই। আমার বয়েস অনেক হলো মা, অনেক দেখলুম। লক্ষ্মীর আর এক নাম চঞ্চলা। এক জায়গায় বেশি দিন কিছুতেই থাকতে চায় না। তা বেশ হয়েছে, অনেক কষ্ট পেয়েছিস মা, এবার একটু সুখে থাক্! যার অমন সোনার চাঁদ ছেলে, তার আবার ভাবনা কিসের!

তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো মাথায় নিলাম।

ডাক্তারবাবু আমার একখানা হাত মামাবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই নিন্ মশাই, আপনার ভাগ্‌নেকে। এ একেবারে হীরের টুকরো। এমন ছেলে হয় না! আমি গরীব মানুষ, কোনও ব্যবস্থাই করতে পারিনি। অতি কষ্টে পড়াশোনা করেছে, তবু—আই-এস্-সিতে থার্ড।—আপনার ছেলেপুলে ক'টি?

মামাবাবু বললেন, দুটি মেয়ে। ছেলে নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন, বাস্। এই আপনার ছেলে।

মামাবাবু বললেন, নিশ্চয়ই। ওকে আমি আর এখানে পড়াবো না। বিলেতে পাঠাবো। ডাক্তারী পড়বে।

ডাক্তারবাবু হো হো করে হাসতে লাগলেন। তাঁর আনন্দ যেন আর ধরে না! বললেন, বাস্, বাস্, বাস্, বাস্! বিন্তু, খুব বড় ডাক্তার হয়ে আসবে। আমি ততদিন বাঁচবো না, আমি দেখতে পাব না। না পাই, ওপর থেকে আশীর্বাদ করবো। না কি বল্?

আবার তাঁকে প্রণাম করলাম। তাঁর পায়ে মাথা হেঁট হয়েই থাকে। এই রকম মানুষ আছে বলেই পৃথিবীটা এখনও বাসের অযোগ্য হয়নি।

ডাক্তারবাবু বললেন, এবার আমি চলি। কই রে অচলা, আয়! আমার হাতে রুগী আছে মশাই, আমিও ডাক্তার। তবে ছোট ডাক্তার মশাই, বড় নই। বড় আর হতে পারলুম কই! দুষ্টু লোকে সব রটিয়ে দিয়েছে—গরীব লোকের কাছে আমি নাকি ফিজ নিই না। বাস্, কেউ আর সহজে পয়সাকড়ি দিতে চায় না। আর দেবেই-বা কেমন করে

বলুন! আপনার মত অবস্থা ক'টা লোকের আছে? সব তো গরীব। দিনে দিনে যেন আরও গরীব হয়ে যাচ্ছে। গরীবের কি কম জ্বালা! দু'বেলা ভাল করে খেতে পায় না। খেতে না পেলেই রোগে ধরে! বাস্, রোগে ধরলেই ডাক্তার। আর ডাক্তারে ধরলেই ওযুধ। কোথায় পাবে বলুন তো! চলি মশাই, বিনুর মামা, রোগ আর ওযুধের নাম ছাড়া আর কারও নাম আমার মনে থাকে না মশাই, কিছু মনে করবেন না, নমস্কার!—দেখেছিস্ অচলা, কত বড় গাড়ী! বিনুভাই বড় ডাক্তার হয়ে আসবে বিলেত থেকে, বাস্, সেই গাড়ীতে চড়ে আমি খুব হাওয়া খেয়ে বেড়াবো—না কি বল্ বিনু!—হো হো করে হাসতে হাসতে তিনি গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

॥ ছয় ॥

আমার জীবনের আর-এক পর্ব সুরু হলো। মামাবাবু ডাক্তারবাবুর কথা সত্যিই রেখেছেন। আমাকে দেখেন ঠিক নিজের ছেলের মত। সব কাজে ডাকেন, পরামর্শ করেন। বলেন, এতদিন আসতিস্ যদি হতভাগা, সব কিছু তোকে দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে যেতুম।

কিন্তু এখানে এসে অবধি একটা ব্যাপার আমি প্রায়ই লক্ষ্য করছি—মামাবাবুর সঙ্গে মামীমার যেন মনের মিল নেই। কথা-কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি যেন লেগেই আছে।

ঝগড়ার গোলমালটা শুনতে পাই, কিন্তু কিসের ঝগড়া বুঝতে পারি না।

বাড়ীতে লোকজন বিশেষ কেউ নেই। মামাবাবুর মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। দু'জনেই শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। অবস্থা ভাল। বেশ আনন্দেই আছে তারা।

মামাবাবুর এক শালা—মামীমার সহোদর ভাই, স্ত্রীপুত্র নিয়ে এই বাড়ীতেই থাকতো।

হঠাৎ একদিন দেখলাম, ফটকে গাড়ী দাঁড়িয়ে। সপরিবারে সে গাড়ীতে গিয়ে উঠছে। আমাকে দেখেই সে বললে, আজ বাড়ী যাচ্ছি। অনেক দিন হয়ে গেল।

তারা চলে যেতেই বাড়ী একেবারে ফাঁকা।

স্নান করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার মা'র গলার আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। শুনলাম, মা জিজ্ঞাসা করছেন মামীমাকে, তোমার ভাই কি দেশে গেল ?

মামীমা বললেন, হাঁ গেল। এখন আর ওর থেকে কি হবে? তোমার ছেলেই তো বাবুর কাজকর্ম সব দেখছে।

খেতে বসেছি। মা কাছে এসে বললেন, তোর বি-এস-সি পড়ার কি হলো? কলেজে যাচ্ছিস না কেন?

বললাম, ক্লাস বসতে দেরি আছে। মামাবাবু বলছিলেন ডাক্তারী পড়বার কথা।

—তাই যাহোক্ কিছু কর বাবা। ঘুরে ঘুরে বেড়াস্ নে।

মামাবাবুকে বললাম

মামাবাবু বললেন, তোমাকে আমি বিলেত পাঠাব ডাক্তারী পড়তে।

বললাম, মা কি দেবেন আমাকে বিলেত যেতে?

মামাবাবু জবাব দেবার আগেই পাশের দরজা দিয়ে মামীমা ঘরে ঢুকলেন। বললেন, কেন দেবে না? ভাইএর মেলা টাকা, ভাগ্‌নের জন্যে বিশ পঞ্চাশ হাজার যদি খরচ করে তো তার আপত্তি করবার কি থাকতে পারে?

কথার সুর কেমন যেন বাঁকা-বাঁকা!

মামাবাবু ভাবতেও পারেননি—মামীমা এমন করে হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমার সুমুখেই কথাটা বলে বসবেন। তিনি যেন বেশ একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, আঃ, তুমি আবার এ-ঘরের মধ্যে এলে কেন?

মামীমার গলার সুর চড়ে গেল। বললেন, নিশ্চয়। আমার বলবার কি অধিকার!

মামাবাবু চটে গেলেন। বললেন, আমার টাকা আমি যা-খুশী তাই করব।

এতক্ষণে বুঝলাম—এঁদের মনোমালিন্যের মূল কোথায়। থামিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। বললাম, আপনারা চুপ করুন। বিলেতে আমি যাব না।

মামাবাবু বলে উঠলেন, কেন যাবিনে? নিশ্চয় যাবি। যেতে হবে।

মামীমা বললেন, মনে থাকে যেন নিজের দুটো মেয়ে আছে তাদেরও দুটো ছেলেমেয়ে আছে। তারাই পাবে এই সম্পত্তি। তাদের টাকা তুমি এমনি করে উড়িয়ে দিতে পারো না।

মামাবাবু বললেন, তাদের অভাব নেই। তাদের বাপের টাকা আছে।

আঙুল বাড়িয়ে আমাকে দেখিয়ে মামীমা বললেন, ওই যিনি আজ উড়ে এসে বসেছেন, তারও বাপের টাকা ছিল। সে সব খেয়ে শেষ করে এখন তোমাকে খেতে এসেছে।

কথাটা ধক্ করে আমার বুকে এসে বাজলো। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। হাত জোড় করে মামীমাকে বললাম, আপনি চুপ করুন মামীমা। আমরা আজই চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

ঘর থেকে আমি বেরিয়ে আসছিলাম।

মামাবাবু আমার পথ আগলে দাঁড়ালেন। বললেন, খবরদার বিন্থ! রাগ করে তোরা যদি চলে যাস আমি কিছু বাকি রাখবো না।

মামীমা ঘরের থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, ওদের যেতে হবে না। ওরা থাক, আমিই চলে যাচ্ছি।

সেদিন যে আগুন জললো সে আগুন আর সহজে নিবলো না।

পোড়া অদৃষ্ট আমাদের। কেনই-বা গেলাম দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে! কেনই বা দেখা হলো মামাবাবুর সঙ্গে! বেশ ছিলাম আমরা গরীব অনাত্মীয় ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে। বড়লোক মামার বাড়ীতে নাই বা আসতাম!

মা বললেন, চল বাবা, আমরা ভবানীপুর চলে যাই।

—যেতে তো চাই মা কিন্তু মামাবাবু—

কথাটা আমার মুখ দিয়ে যেন বেরোতে চাইলো না।

মা ধরে বসলেন, বল্।

—কি বলবো?

—কি যেন বলতে বলতে থেমে গেলি!

বললাম, মামাবাবু সেদিন আমার হাতখানা চেপে ধরে কি বললে জানো মা? বললে ওর কাছে আমাকে একলা ফেলে তোরা যাসনে বাবা। তোরা চলে গেলে আমি মরে যাব।—

এর পরে আমাদের যত কষ্টই হোক্ যাওয়া চলে না।

আমরা রইলাম। কিন্তু মামীমাকে কিছুতেই ধরে রাখা সম্ভব হলো না। কারও কথা না শুনে বাড়ীর একটা পুরণো চাকরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেলেন তাঁর বাপের বাড়ী।

মামাবাবু রেগে টং হয়ে তক্ষুণি ড্রাইভারকে ডেকে বললেন—গাড়ী বের কর।

গাড়ী নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

ভেবেছিলাম—গেলেন বুঝি মামীমাকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সন্ধ্যায় ফিরে এলেন একা। মুখের চেহারা এত গম্ভীর যে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না।

দু'দিন তিনি কারও সঙ্গে কথাই বললেন না।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যায় তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি—কাকে যেন তিনি টেলিফোন করছেন। একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো—তাঁর শরীরে কোথায় যেন যন্ত্রণা হচ্ছে, ডাক্তারকে আসতে বলছেন।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে দিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলাম, শরীর কি খারাপ মনে হচ্ছে ?

মামাবাবু হাতের ইশারায় আমাকে কাছে বসতে বললেন। ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না তিনি। ধীরে ধীরে বললেন, অনেকদিনের পুরণো অসুখ ভাল হয়ে গিয়েছিল আবার জানিয়েছে কাল থেকে। বুকের যন্ত্রণা। মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে।

ডাক্তার এলেন।

ইন্‌জেক্‌শানের পর ইন্‌জেক্‌শান চলতে লাগলো।

মা'র মুখখানা গেল শুকিয়ে। আমাকে ডেকে বললেন, তোর মামীমাকে আনবার জন্যে লোক পাঠিয়ে দে।

—অনেক বলেছি। মামাবাবু বারণ করছেন।

রাত্রির দিকে যন্ত্রণা বাড়লো।

মা অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন, করুক্‌গে বারণ। খবর না দিলে অন্যায় হবে। তোর বাবার ঠিক এমনি হয়েছিল।

কিন্তু মামীমাকে আনবার কোনও ব্যবস্থাই আমি করলাম না। ক্রমাগত মনে হতে লাগলো—মামীমা কাছে থাকলে মামাবাবুর বুকের যন্ত্রণা বাড়বে বই কমবে না।

পরের দিন দুপুরে ঠিক আমার বাবার মত মামাবাবুর চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ে গেল।

হঠাৎ মনে পড়লো আমাদের ভবানীপুরের ডাক্তারবাবুর কথা। এরকম বিপদের দিনে আমাকে কেউ যদি সাহায্য করতে পারেন—একমাত্র তিনিই পারবেন। ছোট একখানি চিঠিতে তাঁকে আসবার জন্য অনুরোধ করে গাড়ী পাঠিয়ে দিলাম।

কিন্তু এমনি আমার অদৃষ্ট যেই ডাক্তারবাবু বাড়ীতে পা দিয়েছেন, মা কেঁদে উঠলেন।

কাছে গিয়ে দেখি সব শেষ হয়ে গেছে।

ডাক্তারবাবু বললেন, হা ভগবান! আমি কি তোমাদের শ্মশানের বন্ধু হবার জন্যেই জন্মেছি?

মৃতদেহ রেখে দিয়েছিলাম। খবর পেয়ে মামীমা এলেন।

এসেই সুরু হলো কান্না আর আমাকে গালাগালি।

—আমি আগেই বলেছিলাম, ও এসেছে ওকে খাবার জন্যে।

মা বললেন, আর আমাদের এখানে থাকা চলবে না, চল ভবানীপুরেই চলে যাই।

সেই ভালো।

যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি, এমন সময় মামাবাবুর এটর্নী মিত্তিরমশাই-এর গাড়ী এসে দাঁড়ালো ফটকে।

মামাবাবুর সঙ্গে একদিন মাত্র আমি গিয়েছিলাম তাঁর আপিসে। আমাকে দেখেই বললেন, আমি কলকাতায় ছিলাম না বাবা, নইলে অসুখের খবর পেয়েই আমি আসতাম। তুমি তো আনন্দময়ের ভাগ্‌নে?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি বললেন, কাল তা হলে তুমি একবার এসো আমার আপিসে। উইলের প্রোবেট নিতে হবে।

বললাম, মাকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

মিত্তিরমশাই বললেন, ও তা হলে তো দেখছি কোনও খবরই তুমি জানো না। আনন্দময় তোমাকেই যে তার সব-কিছুর মালিক করে দিয়ে গেছে!

আমার মাথাটা তখন ঝিম ঝিম করছে। কি যে করবো, কি যে বলবো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মিত্তিরমশাই বললেন, আনন্দময়ের স্ত্রী কোথায় রয়েছেন বাবা? এলাম যখন একবার দেখা করেই যাই। ডাকো ওঁকে।

বললাম, আমার সঙ্গে বাক্যালাপ নেই। আপনি ডাকুন।

—সর্বনাশ!—মিত্তিরমশাই বলে উঠলেন, তা হলে তো আগুন জ্বলবে বাবা! থাক, আমি চলি। তুমি কাল এসো।

মিত্তিরমশাই চলে গেলেন।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কাঠের পুতুলের মত।

মা ডাকাডাকি করছেন। ভবানীপুর যাবেন তিনি। এখানে থাকতে চান না।

উইলের খবরটা মাকে জানালাম।

মা নির্বাক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মা বললেন, তুই থাক বিনু, আমাকে কাশীতে দিয়ে আয়। আমি কাশী যাব।

অথচ আমার তখন এমনি অবস্থা এক পা নড়বার উপায় নেই। ভবানীপুর থেকে ডাক্তারবাবুকে আনালাম।

মার সঙ্কল্প থেকে কেউ তাঁকে টলাতে পারলে না।

মিত্তিরমশাই ঠিকই বলেছিলেন।

মা গেলেন কাশী।

উইলের সংবাদ শুনে মামীমা বোমার মত ফেটে পড়লেন। বললেন, এ উইল জাল।

কেউ তাঁকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারলে না। তিনি সেই এক কথা বারংবার বলতে লাগলেন, ও যখনই এসেছে এ বাড়ীতে তখনই জানি এমনি একটা সর্বনাশ করবে ও। ওর বাপটা ছিল জালিয়াৎ। মাকে ওই জন্যে কাশী পাঠিয়ে দিলে।

মামীমার বাবা জমিদার। দাদা উকিল।

এ উইল যে মামাবাবু নিজে করে গেছেন সেকথা কেউ বিশ্বাস করলেন না।

মামলা রুজু হলো হাইকোর্টে।

আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মিত্তিরমশাইকে গিয়ে বললাম, এখন আমার কি করা উচিত সেই পরামর্শ দিন।

মিত্তিরমশাই বললেন, উইল আমিই করেছি বাবা। আমি জানি আনন্দময় স্বেচ্ছায় সুস্থমনে সুস্থদেহে তোমাকেই তার সব-কিছু দিয়ে গেছে। তোমার মামীমার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি যখন বলছেন—তাঁর স্বামীর উইল জাল উইল, তখন তিনিই তাই প্রমাণ করুন।

মামলা চলতে লাগল।

আর চলতে লাগলো আমার উত্থেশ্তে অকথা কুকথা ভাবা!

তাঁরও জেদ চড়ে গেল, আমারও জেদ চড়ে গেল।

একই বাড়ীতে থাকি, অথচ এই রকম একটা বিশ্রী ব্যাপার দিনে-দিনে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগলো।

ভাবলাম, বাড়ীতে লোকজন রেখে দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করি।

এমন দিনে মামীমার বাবা আর তাঁর দাদা আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

মামীমার বাবা বললেন, এর একটা মীমাংসা করে নাও বাবা।

আমি বললাম, যা বলবেন আমি তাই করতে রাজী। এ সম্পত্তি তাঁরই, তিনিই মালিক, আপনারা বিশ্বাস করুন, উইল জাল করা দূরে থাক, আমি এর বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না।

মামীমার দাদা বললেন, তাহলে বেশ, তুমি এক কাজ কর। অর্ধেক সম্পত্তি ওকে ছেড়ে দাও।

—এক্ষুনি দিচ্ছি। শুধু জালিয়াৎ অপবাদটা তিনি যেন আমাকে না দেন। এইটুকু অনুরোধ আমি তাঁকে করবো।

তাঁরা সানন্দে এই সংবাদটি বহন করে নিয়ে গেলেন মামীমার কাছে।

মামীমা বললেন, কখ্খনো না। এ সম্পত্তি—হয় আমার, নয় ওর। অর্ধেক নিতে রাজী নই।

মীমাংসা হলো না।

হাইকোর্টের বিচারে তিনি হেরে গেলেন।

শুনলাম, মামীমা তাঁর বাপ-দাদার সঙ্গে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

আমি নিজে গেলাম তাঁর কাছে। এ বাড়ী ছেড়ে যেতে আমি তাঁকে নিষেধ করবো, ক্ষমা চাইবো, বলবো—আমার ওপর আপনার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে গেছেন আমার মামাবাবু। তার আদেশটুকু আমাকে পালন করতে দিন।

এই কথা বলবার জন্যেই গিয়েছিলাম।

প্রণাম করবার জন্যে যেই আমি মাথা হেঁট করেছি, মামীমা আমার মাথার ওপর এক লাথি মেরে চীৎকার করে উঠলাম—দূর হ' জালিয়াৎ আমার চোখের সুমুখ থেকে।

দু'চোখ আমার জলে ভরে এলো। চলে এলাম সেখান থেকে।

মামীমা সত্যিই বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন।

বাড়ীতে আমি একা।

মামীমা নেই, মা নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই। শুধু এক বিরাট অট্টালিকা আর প্রচুর ধন-সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী নিঃস্ব নিঃসম্বল কপর্দকশূন্য এক ভিখারীর পুত্র।

সেই সব দিনের কথা আমায় মনে হতে লাগলো—বাবার অন্তিমশয্যায় নিরুপায়ের মত বসে বসে যেদিন কেঁদেছিলাম আমি আর আমার মা!

অর্থাভাবে ডাক্তার ডাকতে পারিনি। মৃতদেহের সৎকারের জন্য পুরোনো কয়েকখানি বই ছিল সেদিন আমার একমাত্র সম্বল!

আর আজ?

এত প্রচুর অর্থ—কি করবো কেমন করে ব্যয় করবো বুঝতে পারছি না।

মাকে এইবার নিয়ে আসি কাশী থেকে।

কাশী যাবার জন্যে সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিচ্ছে আমার চাকর, এমন সময় একখানি চিঠি।

কাশীর চিঠি। মা লিখেছেন—

আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না বিনু। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। মরবার আগে একটিবার তোমায় দেখতে ইচ্ছা করছে। যদি সময় পাও তো এসো।

মনে তুমি কষ্ট পাবে বলে একটি কথা তোমাকে আমি বলিনি। অর্থের নেশায় মেতে তোমার বাবা জীবনে বহু অপকর্ম করে তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন শেষ জীবনে। তোমারও শরীরে তোমার বাবার রক্ত। তাই ঠাকুরের কাছে দিবারাত্রি প্রার্থনা করছি, তোমার অপরাধ তিনি যেন ক্ষমা করেন!

একটি কথা শুধু জেনে রেখো বাবা—অর্থ মানুষের প্রয়োজন, কিন্তু অর্থের সঙ্গে অনর্থ আসে। অর্থ মানুষকে কখনো সুখী করতে পারে না। অর্থের মধ্যে সুখের সন্ধান তোমার বাবাও করেছিলেন। কিন্তু তুমি নিজের চোখে দেখেছো—সুখ শান্তি তিনি পাননি।

আশীর্বাদ করি তুমি তুমি সুখী হও। ইতি—

তোমার হতভাগিনী

মা—

কাশী গেলাম।

গিয়ে দেখি, যে বাড়ী ভাড়া করে মাকে আমি রেখে এসেছিলাম, সেখানে তিনি নেই। খবর পেলাম—তিনি আমবেড়িয়া ছত্রে চলে গেছেন।

দাতব্য ছত্রে গেছেন আমার মা? কেন? কোন দুঃখে?

ছত্রে গিয়ে যা দেখলাম—তার চেয়ে আমার মাথায় যদি আকাশের বজ্র নেমে আসতো, তাও বোধ করি ছিল ভাল।

ছত্রের ছোট একটি অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার ঘরের মলিন শয্যায় আমার মা'র মৃতদেহ—সাদা একটা চাদর দিয়ে ঢাকা। গত রাত্রে তিনি মারা গেছেন। ছত্রের যিনি ম্যানেজার তিনি টেলিগ্রাম করেছেন আমাকে।

টেলিগ্রাম করে তাঁরা আমার আসার অপেক্ষায় বসে আছেন।

মার হাতের একখানি চিঠি আর পঁচিশ টাকা তিনি আমার হাতে দিয়ে বললেন, আপনার মা এইগুলি দিয়ে গেছেন আপনাকে দেবার জন্যে।

—আপনি যদি না আসতেন—আমার ওপর আদেশ ছিল তার মৃতদেহ সৎকার করবার পর টাকা যা বাঁচবে, তা' যেন আমি বিতরণ করে দিই দীনদুঃখী অন্নহীন ভিখারিণী যারা—তাদের মধ্যে। আর এই চিঠিখানি আপনাকে যেন পাঠিয়ে দিই।

তখন চোখের জলে চিঠি আমি পড়তে পারছিলাম না। তবু পড়লাম—

মা লিখেছেন—

বিনু—

দেখা বোধহয় আর হলো না। আমার স্বামী আমার জন্য একটি কানাকড়ি রেখে যাননি! আমি তাই তোমার দেওয়া টাকা তোমাকেই ফেরত দিয়ে গেলাম। আবার আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও। কিন্তু বাবা, আমার শেষ অনুরোধ, তোমার বাবার মত অর্থের মোহে যে হাত দিয়ে তুমি তোমার মামার উইল জাল করেছো, সে হাত দিয়ে আমার মুখাগ্নি যেন করো না।

মা—

মা—মা আমার!

আমি কেমন করে বুঝিয়ে বলবো—উইল আমি জাল করিনি। তুমি আমার বাবাকে জানতে, তাই তুমি আমাকে ভুল বুঝে চরম শাস্তি দিয়ে গেলে। কিন্তু মা আমার, এ তোমার রক্ত আছে যে মা! হয়তো বা শুধু সেই জন্যই অর্থের প্রতি মোহমুক্ত হয়ে আমি থাকতে পেরেছি।

মা'র মুখাগ্নি আমি করিনি।

আমি নিরাপরাধ। কিন্তু নিজের সন্তানকে ভুল বুঝে যে চলে গেল তার ভুল আমি ভাঙাবো কেমন করে?

কি করবো আমি এই রাজার ঐশ্বর্য নিয়ে?

এ জীবন আমি রাখবো না। পরলোক যদি থাকে তো সেইখানে গিয়ে মাকে আমি বুঝিয়ে বলবো—আমাকে তুমি ক্ষমা কর মা।

মা'র শেষ-কৃত্য শেষ করে একটা কাগজে লিখলাম—আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নয়। আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করলাম।

আমার মৃত্যু সংবাদ 'মামীমার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য পাগলের মত আমার ম্যানেজারকে লিখে দিলাম—ছত্রের ম্যানেজারের নাম দিয়ে—

গত রাত্রে আপনার মনিব সুবিনয় মুখোপাধ্যায় মারা গিয়াছেন। এই সংবাদটি 'কলিকাতার সংবাদ পত্রে সর্বপ্রথম প্রচার করিয়া দিয়া আপনি এখানে আসিবেন।

তাঁহার মাতাঠাকুরাণী গত রবিবার রাত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইতি।

পাগলের মত কাশীর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ একটা ডাকঘর নজরে পড়তেই চিঠিখানি ডাকে দিয়ে দিলাম।

তারপর কবে কতদিন পরে আমার ঠিক মনে নেই, কলকাতা ফিরে এলাম ট্রেনে চড়ে।

আত্মহত্যা আমি করতে পারিনি।

মা'র কথাই সত্য কিনা তাই-বা কে জানে!

বাবার রক্ত আমার শরীরে। মামাবাবুর অতুল ঐশ্বর্য আমাকে আবার সেই পথে টেনেছে কিনা তাও ঠিক বুঝতে পারছি না।

হাওড়া স্টেশনে পা দিতেই সকালের খবরের কাগজে দেখি—আমার মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছে। সারাদিন আত্মগোপন করে সন্ধ্যার অন্ধকারে মামাবাবুর বাড়ীতে ফিরে এসে দেখি—আমারই মৃত্যুতে শোকসভা বসেছে।

তারপর সবই তো বলেছি।

এখন কে বলে দেবে আমি কি করবো?

গল্প

প্রাপ্তিযোগ

অনেকদিন পরে বন্ধু সুকুমারের সঙ্গে দেখা। "কি রে কেমন আছিস?"

"ভাল।"

এ কথা সে কথার পর বললাম, "চল্ এই পার্কের বেঞ্চে একটুখানি বসা যাক্। গল্প করিগে চল্।"

দু'জনে একটা বেঞ্চির উপর গিয়ে বসলাম।

কথা কইতে কইতে হঠাৎ আমার নজর পড়লো—সুকুমার তার হাতের একটি আঙুলের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে।

"ওখানে আবার কি হোল তোর?"

"হয়নি কিছুই।" ব'লে সে তার আঙুলটি আমায় দেখালে।

দেখলাম: একটি আঙুলে আংটি পরার দাগ। আংটিটা বোধহয় খুলে রাখা হয়েছে। কিন্তু তার দাগ এখনো মিলোয় নি। বললাম, "আংটির দাগ না?"

সুকুমার বললে, "হ্যাঁ। সে আংটিটা তুই আমার দেখেছিলি?"

হয়ত দেখেছিলাম; কিন্তু আংটির কথা কে আর মনে করে রাখে!

সুকুমার বললে, "সোনার একটি আংটি। খুব যে দামী জিনিষ, তা নয়। তবে কেমন করে সেটা আমি পেয়েছিলাম শোন্।..."

…বছর পাঁচেক আগে অভাব কাকে বলে তখন আমি জানতাম না। সন্ধ্যেবেলা একদিন বাড়ী ফিরছি, পথের ওপর একটা মণিব্যাগ কুড়িয়ে পেলাম। কার মণিব্যাগ, কে ফেলে গেছে কে জানে। বাড়ী ফিরে মণিব্যাগটা খুলে দেখি, খুচরো গোটা পাঁচ-ছয় টাকা, একটি সোনার আংটি, আর প্রকাণ্ড একতাড়া নোট। নোটের তাড়াটা গুণে দেখলাম—পাঁচ-শ টাকা। আহা বেচারা! যার গেছে এতক্ষণ হয়ত সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। সারারাত আমার আর ঘুম হলো না। দাদাকে বললাম। আনন্দে মুখখানি তার শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। আনন্দে মানুষের মুখ উজ্জ্বল হবারই কথা, কিন্তু দাদার মুখখানি শুকিয়ে গেল এই ভেবে যে একটা পয়সা সে নিজে কোনদিন কুড়িয়ে পায়নি। আর এই সুকুমার ছোঁড়াটা—রোজগার করতে হোল না, পরিশ্রম করতে হ'লো না—এত টাকা একেবারে মুফৎ পেয়ে গেল।

দাদার মনের কথাটা আমি বুঝলাম। বললাম, "ভেবো না দাদা, যার টাকা তাকে আমি ফিরিয়ে দেবো।"

দাদা বললে, "পাগল হয়েছিস্? ফিরিয়ে আবার দেয় নাকি কখনও। কার টাকা তুই বুঝবি কেমন করে? মাঝখানে থেকে কে না কে মেরে দেবে। তার চেয়ে এক কাজ কর।"

বললাম, "কি কাজ?"

দাদা একটুখানি হেসে বললে, "আড়াই-শ' তুই নে, আড়াই-শ' আমায় দে।"

কিন্তু তা আমি দিলাম না। মণিব্যাগ থেকে খুচরো টাকা ক'টি বের করে নিয়ে, তাই দিয়ে দৈনিক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম।

"গত শনিবার সন্ধ্যায় শ্যামপুকুর স্ট্রীটের উপর আমি একটি মণিব্যাগ কুড়াইয়া পাইয়াছি। যিনি মণিব্যাগের মালিক, তাঁহাকে সেটি আমি ফিরাইয়া পাইয়াছি। কি রকম মণিব্যাগ এবং তাহার মধ্যে কি কি আছে যিনি বলিতে পারিবেন; তাঁহাকেই উহা আমি ফিরাইয়া দিব।"

বিজ্ঞাপন পড়ে বুড়ো এক ভদ্রলোক কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলেন। বলিলেন, "মেয়ের বিয়ের জন্য বাড়ী বন্ধক রেখে টাকা ক'টি এনেছিলাম বাবা। তোমায় কি বলে যে আশীর্বাদ করবো…"

যাই হোক, তার কথা শুনে বুঝলাম, মণিব্যাগটা তাঁরই।

টাকা সমেত ব্যাগটি তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "বিজ্ঞাপনের জন্য চারটি টাকা খরচ করেছি।"

"বেশ করেছ বাবা; খুব ভাল কাজ করেছ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি বাবা, তোমার অর্থের অভাব জীবনে যেন কোনদিন না হয়।—কিন্তু বাবা আমার একটি জিনিস তোমায় নিতে হবে।"

এই বলে তিনি তাঁর মণিব্যাগটা খুলে সেই সোনার আংটি-টি বের করে আমার হাতের আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন। বলিলেন "এর চেয়েও অনেক কিছু বেশী তোমায় আমার দেওয়া উচিত বাবা, কিন্তু—"

দেখলাম তাঁর চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে জল গড়িয়ে এসেছে।

এই পর্যন্ত স্কুমার আমার মুখের পানে তাকালে। বললে, "সেই থেকে সেই ভদ্রলোকের দেওয়া আংটি-টি আমার হাতেই ছিল। যতবার সেই আংটি-টির দিকে তাকাতাম, মনে হতো, যে-লোভ মানুষের পরম শত্রু সেই লোভকে আমি জয় করেছি। ভাল কাজ করবার সুযোগ মানুষের জীবনে খুব কমই আসে, আমার জীবনে এসেছিল মাত্র ওই একটিবার।—তারপর কি হোল শোন।"

বলেই সে আর একটি গল্প বলতে আরম্ভ করলে। বললে—

"পাঁচ বছর পরের ঘটনা।—এই সেদিন, এই পাঁচটি বছরের মধ্যে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। বাবা মারা গেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ঋণের দায়ে আমাদের এত বড় বাড়ীখানি বিক্রি করতে হয়েছে। সংসারে আমাদের লোকজন বড় কম নয়। বিধবা পিসিমা, বিধবা দুই বোন, বোনদের ছেলেমেয়ে, ছোট ছোট তিনটে ভাই, তার ওপর দাদার একটি মস্ত সংসার। ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করছি। অভাবের আর অন্ত নেই।

দাদা বললে, "একটা চাকরির চেষ্টা দেখ স্কুমার।"

তাই আমায় করতে হল, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে কত যে দরখাস্ত করলাম, তার ঠিক নেই। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আপিসে আপিসে টো টো করে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রোদে ঘুরে বেড়াতে কষ্ট হয়। দাদাকে বললাম, "একটা ছাতা কিনে দাও দাদা!"

দোকানে ছাতা কিনতে গিয়ে দাদা বললে, "এখন বুঝেছিস ত স্কুমার, সেই যে সেই পাঁচশ টাকা তখন যদি ভালমানষী করে না ফিরিয়ে

দিতিস ত আজকে আর ভাবতে হত না। স্বাধীনভাবে যা হোক একটা কিছু ব্যবসা-ট্যাবসা করতে পারতিস।"

দাদাকে কিছু বলতে পারলাম না। মনে মনেই হাসলাম। এখন সে টাকাটা পেলে সত্যিই ফিরিয়ে দিতাম কি না তাই বা কে জানে।

যাই হোক,' নতুন ছাতি মাথায় দিয়ে চাকরির সন্ধান করতে থাকি। আর ভাবি, কেমন করে কিছু রোজগার করা যায়। দাদা যা মাইনে পান তাই দিয়েই কি কষ্টে যে আমাদের সংসার চলে তা ত স্বচক্ষেই দু'বেলা দেখতে পাই। দাদার কষ্ট হয় বুঝতে পারি, অথচ নিরুপায়।

সেদিন বেলা তখন প্রায় দুটো। অপিসের এক বড়বাবু তিনটের সময় দেখা করতে বলেছেন। হেঁটে হেঁটে সেইখানেই চলেছি। ভয়ানক পিপাসা পেয়েছে, অথচ রাস্তার কলে তখনও জল আসেনি। ভাবলাম একটা পান খাই। পথের ধারে একটা দোকানে দাঁড়িয়ে পান কিনছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। দোকানীকে বললেন, "একটা সিগ্রেট দাও।"

তিনি কিনলেন সিগ্রেট, আর আমি কিনলাম পান।

দোকান থেকে কয়েক পা মাত্র এগিয়ে গেছি, সেই ভদ্রলোকও আমার পাশাপাশি পথ চলছিলেন; সিগ্রেটে একটা টান দিয়ে আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, "এই দোকান থেকে পান কিনলেন কিন্তু পান ও ব্যাটা ভাল সাজতে জানে না। পান যদি কোনদিন খান ত ওই যে ওই জলের কলটা দেখছেন, ওরই পাশ দিয়ে ওই যে গলিটা বেরিয়ে গেছে ওই গলির মাথায়—"

রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে আঙুল বাড়িয়ে তিনি আমায় গলিটা দেখাচ্ছিলেন। কথাটা তখনও তাঁর শেষ হয়নি এমন সময় কালো মত একটা লোক আমাদের সুমুখে রাস্তার ওপর থেকে হেঁট হয়ে কি যেন কুড়িয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল।

লোকটা কি যে কুড়িয়ে পেলে বুঝতে পারলাম না, তবে ব্যাপারটা আমাদের চোখ এড়াল না। তিনিও দেখলেন, আমিও দেখলাম।

যাই হোক, ভদ্রলোক আবার তাঁর নিজের কথার জের টেনে বলতে

চমৎকার। একদিন অন্ততঃ খেয়ে দেখবেন। জীবনে আর ভুলতে পারবেন না।"

বললাম, "পান বড় একটা খাই না। হঠাৎ আজ ইচ্ছে হল তাই..."

এই বলে আমিও চলছি, তিনিও চলছেন।

এমন সময় এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে আমাদের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন।—"হ্যাঁ মশাই, আমার একটা জিনিস আপনারা কুড়িয়ে পেয়েছেন—এই রাস্তার উপর? হ্যাঁ, ঠিক এইখানে—এইখানে দাঁড়িয়েই..." বলে তিনি রাস্তার দিকে কেমন যেন হতাশ হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, "আমরা পাই নি, তবে একটা লোক কি যেন কুড়িয়ে পেলে বলে মনে হল।"

"লোকটা কোন্ দিকে গেল বলতে পারেন? কি রকম লোক, দেখে কি আর তাকে চিনতে পারব?"

ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন দেখলাম। বললাম, "কালো মত লোকটা; গায়ে একটা সাদা গেঞ্জিও পরে আছে, এইদিকে গেল বলেই মনে হচ্ছে।"

আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, "না না, এদিকে ত যায় নি; এইদিকে গেল আমি দেখলাম।"

বলে তিনি আঙুল বাড়িয়ে ঠিক তার উল্টো দিকটা দেখিয়ে দিলেন।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সেইদিকেই ছুটলেন।

বললাম, "না মশাই, আপনি ভুল বললেন, আমার মনে হল এইদিকে গেল।"

তিনি বললেন, "যেদিকেই যাক না দাদা, আমাদের কি! ও ধনী লোক, ওর অনেক আছে, আর যে পেয়েছে সে হয়ত গরীব মানুষ, পাক না একটা-আধটা টাকা।"

পথ চলতে চলতে আমরা মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়ালাম। অনেকগুলো গাড়ী পার হচ্ছিল। বাধ্য হয়েই দাঁড়াতে হল।

"এই ব্যাটা এই, শোন! শোন!"—দেখলাম হাতের ইসারায় তিনি কাকে ডাকছেন।—"দেখুন তো ঐ লোকটা না?"

দেখলাম গেঞ্জি গায়ে সেই কালো মত লোকটিই বটে। তাঁর ডাক শুনে সে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, "কই দেখি তুই কি কুড়িয়ে পেলি?"

পথের মাঝখানে এই এতগুলো লোকের সুমুখে জিনিসটা দেখাতে সে চাইলে না। বললে, "আসুন বাবু, একটুখানি আড়ালে আসুন!"

আমরা দু'জনেই তার পিছু পিছু গিয়ে একটা গলির ভিতর ঢুকলাম। গলিতে লোকজন নেই। একেবারে নির্জন বললেই হয়।

অতি সন্তর্পণে লোকটা দেখালে,—কাগজে মোড়া লম্বা লম্বা দুটো গিনি সোনার বার। সোনাটা হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে একবার দেখলাম। তা প্রত্যেকটার ওজনও নেহাৎ কম নয়। কুড়ি-পঁচিশ ভরি তো হবেই।

আমার সঙ্গীটি বললেন, "তুই এ দুটো নিয়ে কি করবি বল্ দেখি? তার চেয়ে এক কাজ কর। আমাদের দু'জনকে দুটো দিয়ে দে। আমাকে একটা দে, আর এই বাবুকে একটা।"

"না বাবু," বলে সোনার জিনিস দুটো সে এক রকম জোর করেই তাঁর হাত থেকে তুলে নিলে।

তিনি বললেন, "আরে, আমরা অম্নি নিতে চাই না। কিছু টাকা তোকে আমরা দিচ্ছি। না কি বলেন মশাই?"

বলেই তিনি আমার মুখের পানে তাকালেন। তাকিয়েই হাসতে হাসতে বললেন, "আর না যদি দিবি বাবা ত এই হাতের কাছেই পুলিশ-থানা, তোকে ধরিয়ে দিতে আর কতক্ষণ।"

লোকটা পুলিশের ভয়েই বোধ করি রাজি হল। বললে, "তা আপনাকে না হয় একটা দিতে পারি বাবু, কিন্তু ঐ ওঁকে কেন দেব?"

আমার সঙ্গীটি বললেন, "বা-রে, উনিই তো আগে দেখেছেন। ওঁকে একটা দিতে হবে বই-কি। আর অমনি তো নেবেন না, কিছু টাকা দিয়েই নেবেন।"

আমার পকেটে কিন্তু খুচরো কয়েক আনা পয়সা মাত্র সম্বল। ভদ্রলোককে একটুখানি দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর কানে কানে বললাম, "টাকা কিন্তু আমারি সঙ্গে নেই।"

ভদ্রলোক কি যেন ভাবলেন, ভেবে বললেন, "কিন্তু সোনার দর জানেন

ঘাড় নেড়ে বললাম, "তা জানি।"

"তবেই ভেবে দেখুন, জিনিস দুটো ছাড়া কি উচিত? আচ্ছা, আসুন ত, আমার সঙ্গে কিছু টাকা আছে।"

এই বলে তিনি তার কাছে আবার এগিয়ে গেলেন। বললেন, "দে জিনিষ দুটো।" বলেই তিনি জিনিস দুটো তার হাত থেকে নিয়ে একটা নিজের পকেটে রাখলেন, আর একটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "রাখুন।"

তারপর তিনি তাঁর পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, "নে বাপু, এই কটা টাকা এখন আছে আমাদের কাছে, আর কিছু নেই। যা চলে যা।"

টাকা ক'টা হাতে নিয়ে লোকটা বললে, "কত টাকা?"

তিনি বললেন, "ষোল টাকা।"

সে ঘাড় নেড়ে বললে, "আজ্ঞে না, তা আমি দেব না। একটা তাহলে আমায় ফিরিয়ে দিন।"

"হ্যাঁ, ফিরিয়ে দেবে না আরও কিছু।" বলে তিনি আমার মুখের পানে তাকালেন। বললেন, "আপনার কাছে কিছু নেই? আচ্ছা—দিন্ আপনার ওই আংটিটা খুলে দিন, ব্যাটা চলে যাক্।"

এই বলে তিনি আমায় আর কোন রকমে ভাববার অবসর না দিয়েই আমার হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে তার হাতে দিয়ে বললেন, "হল তো এবার? যা ব্যাটা যা, অনেক হয়েছে।"

লোকটা কিন্তু তখনও খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। বললে, "দিন বাবু, এই ছাতাটাও দিন তাহলে।" বলেই সে আমার হাত থেকে নতুন ছাতিটি এক রকম কেড়ে নিয়েই চলে গেল।

সঙ্গী ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, "যান মশাই, আজ অনেক লাভ হয়ে গেল। কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলেন কে জানে।"

কি জানি, কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম আমার ঠিক মনে নেই। সেদিন আমার আর আপিসের সেই বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করা হলো না। বাড়ী ফিরে গেলাম। যাক্ পঁচিশ ভরি না হোক অন্ততঃ বিশ ভরিও তো আছে। সংসারের অনেক দুঃখ হয়ত লাঘব হল।

আপিস থেকে দাদা ফিরে এল। সোনাটা তাকে দেখিয়ে বললাম, "এই ত্থাখ দাদা, আজ অনেক কিছু লাভ করেছি।"

দাদা ত আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বললে, "যাক, এবার মালিককে ওটা ফিরিয়ে যে দিস নি—এই যথেষ্ট। চল একটা জানাশুনা পোদ্দারের দোকানে ওটা বিক্রি করে দিয়ে আসি।"

"চল।" বলে আমরা দু'ভাইএ বেড়িয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে ঠিক হল, চাকরী আমি আর করব না। এই টাকা দিয়ে যে কোনও একটা কারবার করলেই চলবে।

দাদা বললে, "তোর 'ধনপ্রাপ্তি যোগ' আছে দেখছি। এমনি করে পরের জিনিস পেয়ে পেয়েই একদিন হয়ত তুই বড়লোক হয়ে যাবি।"

সোনার বারটা নেড়ে চেড়ে দেখে পোদ্দার তার কষ্টিপাথর বের করলে। পাথরের ওপর বেশ ভাল করে বারকতক কষে এ্যাসিড দিয়েই হো হো করে হেসে উঠল। সোনার বারটা আমাদের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, "পেতল।"

আমার বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। দাদার মুখখানি গেল শুকিয়ে।

হাতের আঙুলটির দিকে তাকালাম। আংটির সাদা দাগ তখনও জল জল করছে। হায়, হায়, সর্বনাশ। যে লোভকে জয় করে আংটিটি আমি পেয়েছিলাম, আজ সেই লোভের কাছে পরাজিত হয়েই সেটি আমার গেল।

স্থকুমারের গল্প এখানেই শেষ হল।

আমি আর না হেসে থাকতে পারলাম না। বললাম, "ছাতিটা বুঝি ফাউ?"

ঠোঁটের ফাঁকে শুকনো একটুখানি হেসে স্থকুমার বললে, "হাঁ, ভাল নতুন ছাতি। মাসখানেক আগে দাদা আমায় কিনে দিয়েছিল।"

মোনা ডাকাত

মোনা ডাকাতের নাম শোনেনি এ রকম লোক আমাদের ও অঞ্চলে নেই বললেই হয়। ইয়া লম্বা চওড়া জোয়ান। টাঙ্গির মতন গোঁফ। মাথায় একমাথা বাবরি-কাটা কোঁকড়ানো চুল। শোনা যায় নাকি গায়ের জোর তার অসাধারণ।

তার এই গায়ের জোর নিয়ে কত গল্প, কত কাহিনী যে লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায় তার আর অন্ত নেই। মোনা নাকি একবার একটি হাতী মেরেছিল, বন্দুকের গুলি তার কিছুই করতে পারে না, চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া, তিনতলা চারতলা বাড়ীর ছাদ থেকে লাফানো—এসব ত তার কাছে ছেলেখেলা!

থাকবার মধ্যে গ্রামের একটেরে মোনার একখানা কুঁড়ে ঘর ছাড়া আর কিছু নেই। মোনা নিজেই কতবার বলেছে, চুরি-ডাকাতি করা টাকা-পয়সা থাকে না বাবু। কেমন করে সে কোনদিক দিয়ে যে উড়ে যায় নিজেই বুঝতে পারি না।

লোকে বলে, বুঝতেই যদি পারিস চুরি তাহলে করিস কেন?

মোনা একটুখানি হেসে জবাব দেয়, থাকতে পারি না বাবু। স্বভাব যায় না মলে।

সংসারে তার নিজের বলতে একদিন সবই ছিল। এখন মাত্র পাঁচ ছ' বছরের ফুটফুটে সুন্দর একটি নাতনী ছাড়া আর কেউ নেই।

স্ত্রী-পুত্র তার কেমন করে গেল তারও একটা গল্প আছে। সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে যা বলে তাই বলছি।

আমাদের গ্রামের উত্তর দিকে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড সোজা চলে গেছে। এই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডই ছিল মোনার শিকারের জায়গা। রাত্রির অন্ধকারে শহর থেকে জিনিষপত্র নিয়ে যারা যাওয়া-আসা করতো মোনার হাতে তারা নিস্তার পেতো না। কত রকম কত নিরীহ যাত্রী যে মোনার হাতে প্রাণ দিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। না চাইতেই মোনার হাতে টাকাকড়ি জিনিষপত্র যারা তুলে দিত তাদের সে কিছু বলত না, কিন্তু জোর জবরদস্তি করলেই মুস্কিল! মাথার উপর প্রচণ্ড এক লাঠির আঘাতেই তাকে সে শেষ করে দিত। মৃতদেহ কোনদিন বা রাস্তার ওপরেই পড়ে থাকত, কোনদিন বা রাণী-সায়রের পাঁকে দিত পুঁতে।

এর জন্যে পুলিশ যে মোনাকে ধরেনি তা নয়। কতবার ধরে নিয়ে গেছে, কতবার সে জেল খেটেছে কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পেয়েই যে-কে সেই!

প্রায় হপ্তাখানেক ধরে মোনার একবার কোনো শিকারই মেলেনি। মনের অবস্থা ভারি খারাপ। সন্ধ্যায় সেদিন প্রচুর মদ খেয়ে প্রকাণ্ড একটা লাঠি হাতে নিয়ে শিকারের সন্ধানে রাণী-সায়রের একটা গাছের তলায় মোনা দাঁড়িয়েছিল।

অন্ধকারে হন্ হন্ করে একটা লোক এগিয়ে আসছে দেখে মোনা ছুটে গিয়ে মারলে তার মাথায় এক লাঠি!

লাঠি খেয়ে লোকটা ঘুরে পড়ল। বললে, বাবা, আমি!

আমি কেরে ব্যাটা! আমি-টামি শুনছি না বাবা, আজ সাতদিন চুপ করে বসে আছি, দে তোর সঙ্গে কি আছে দে!

বলেই মোনা হাত পাতলে। কিন্তু একি! লোকটা আর কথাও কয় না, নড়েও না! বোধহয় এক লাঠিতেই শেষ হয়ে গেছে। অন্ধকারে সে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলে, গায়ে জামা নেই, হাতেও কিছু নেই। টাকাকড়ি হয়ত ট্যাঁকে গোঁজা আছে ভেবে কোমরের কাপড়টা ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখলে, ছ'টি মাত্র পয়সা। তাই তা-ই। পয়সা ছ'টা নিয়ে সে উঠে

দাঁড়ালো। বললে, এবারে বাঁচতে পারিস ত বেঁচে ওঠ্, বাবা, আমার কোনো আপত্তি নেই।

শিকারের সন্ধানে সে আরও কিছুক্ষণ রইলো গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেদিন আর ওই ছ'টা পয়সার বেশি সে পেলে না, মনের দুঃখে বাড়ী ফিরে এলো।

পরের দিন সকালে গ্রামের মধ্যে এক হুলস্থুল কাণ্ড। মোনা ডাকাতের ছেলে মাধবের মৃতদেহ রাণী-সায়রের পাড়ে আছে। গ্রামের ছেলে-বুড়ো সেখানে ভিড় করে গিয়ে দাঁড়ালো, থানা থেকে পুলিশ এলো, কনস্টেবল এলো, চৌকিদার এলো।

কথাটা মোনার কানে যেতেই সে একবার চমকে উঠলো। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন ভেবে সে ছুটল রাণী সায়রের দিকে। চোখ দিয়ে তখন তার দরদর করে জল গড়াচ্ছে। গিয়ে দেখলে, মৃতদেহটাকে জড়িয়ে ধরে তার স্ত্রী তখন চীৎকার করে কাঁদছে আর বুক চাপড়াচ্ছে। বৌ কাঁদছে মাটিতে শুয়ে আর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাধবের দশ বছরের মেয়ে রাণী আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে।

সর্বনাশ! সবাই জানে রাস্তার ধারে রাত-বিরেতে ঠেঙিয়ে মানুষ মারে মোনা ডাকাত। আজ সেই তার ছেলেকে কে মারলে কে জানে! মোনাই যে তাকে মেরেছে সে কেউ ভাবতেও পারলে না। হোক না ডাকাত, তাই বলে নিজের ছেলেকে কেউ মারতে পারে নাকি?

অনেকে বলতে লাগলো, এমনিই হয়। কত লোকের কত ছেলেকে সে মেরেছে, তার ছেলে মরবে না ত কে মরবে! ভগবান আছেন ঠিক।

পুলিশ লাস নিয়ে চলে গেল। কে যে তাকে মেরেছে তার আর কোন কিনারা হলো না।

এই নিয়ে গ্রামের মধ্যে দিন পনেরো খুব আন্দোলন চললো। যেখানে সেখানে যার তার মুখে শুধু এই কথা ছাড়া যেন আর কথা নেই।

তারপরেই সব চুপচাপ।

এমন দিনে মোনার বাড়ীতে আর এক বিপদ।

ছেলেকে নিজের হাতে খুন করে পর্যন্ত মোনা যেন কেমন গুম হয়ে গিয়েছিল। কারো সঙ্গে ভালো করে কথা বলতো না, কাজ কর্ম তার একদম বন্ধ, বাড়ীতে নিত্য অভাব যেন তার লেগেই রইলো।

স্ত্রী তার ঝগড়া করতে লাগলো; যেমন কর্ম তেমনি ফল। এত অধর্ম সইবে কেন?

মোনা চুপ করে রইলো, একটি কথারও জবাব দিলে না।

তারপর মোনা একদিন কিছুতেই আর থাকতে পারলে না। সত্যি কথাটা এখনও সে কাউকে বলেনি। হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যায় তার মনে হলো কথাটা না বললে এবার সে হয়ত ভেতরে ভেতরে গুমরে গুমরে মরেই যাবে। তাই সে তার স্ত্রীকে বলে ফেললে, ছাখো, মাধবকে সেদিন আমি মেরে ফেলেছি।

স্ত্রী তার মুখের পানে হাঁ করে চেয়ে রইলো, তুমি? কেন?

অন্ধকারে চিনতে পারিনি। নেশার ঝোঁকে—

কথাটা যে আর শেষ করতে পারলে না। শুয়ে শুয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো।

মোনা ডাকাতকে এমন করে কাঁদতে তার স্ত্রী কোনদিন দেখেনি।

পরের দিন সকালে দেখা গেল, রান্নাঘরে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে মোনার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে।

স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, রইলো বিধবা বৌ আর নাতনী।

বিধবা বৌ তার অনেকদিন থেকেই জ্বরে ভুগছিল। এমনি মজা, শাশুড়ী মরার মাসখানেক পেরোতে না পেরোতেই বিধবা বৌটাও তার মরে গেল।

বাকী রইলো শুধু তার নাতনী রাণী!

লুকিয়ে লুকিয়ে লোকে বলতে লাগলো, এবার ওটাও যাবে।

মোনারও কেমন যেন মনে হলো বিধাতার অভিশাপ! পাপীকে ভগবান বুঝি এমনি করেই শাস্তি দেন।

রাণী বড় সুন্দরী মেয়ে। মোনার বাড়ীতে মেয়েটাকে মোটেই মানায় না—এত সুন্দরী

সারা গ্রামের মধ্যে তার মত রূপসী আর আছে কিনা সন্দেহ। সাদা ধপধপে করছে তার গায়ের রং। যেন দুধে-আলতায় গোলা। কালো কালো চুলের গোছা তার সারা পিঠটাকে ঢেকে দেয়। মুখের পানে তাকালে আর সহজে চোখ ফেরানো যায় না। দশ বছরের মেয়ে এমনি গাড়ন্ত গড়ন, মনে হয় যেন এরই মধ্যে সে কৈশোর অতিক্রম করেছে।

এখন এই মেয়েটাই হলো মোনার একমাত্র অবলম্বন। চব্বিশ ঘণ্টা ডাকে, দিদি!

রাণী কাছে এসে দাঁড়ায়, বলে, কি বলছো দাছ?

মোনা বলে, কিছু বলিনি দিদি। কি করছো তাই জিগেস করছি।

রান্না করছি দাছ। অম্বলটা হয়ে গেলেই তোমাকে খেতে দেবো।

মানুষ মারার ব্যবসা মোনা এখন একদম্ ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়েছে শুধু এই মেয়েটার জন্যে।

নিতান্ত যখন অভাব পড়ে, এতদিনের অভ্যেস, এক একবার তার মনে হয়—যাই মাকালী বলে কিছু রোজগার করে আনি! কিন্তু লাঠিটা হাতে নিয়েই আবার নামিয়ে রাখে। মনে হয় ভগবান যদি তাকে আবার শাস্তি দেন! যদি এই মেয়েটাও মরে যায়।

আগে সে জেল-কয়েদকে মোটেই ভয় করতো না। কতদিন কত ব্যাপারে তার জেল হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে জেলে গিয়ে ঢুকেছে, আবার মেয়াদ ফুরোতেই বুকের ছাতি ফুলিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছে।

এখন মনে হয় জেলে যাওয়া তার কোনমতেই চলতে পারে না। সে যদি জেলে যায়, এই মেয়েটা পথে দাঁড়াবে। একে দেখবার আর কেউ নেই। ছ'বেলা ছমুঠো খাবার অভাবে হয়ত মরেই যাবে।

রাণীকে মোনা সুখে রাখতে চায়। সংসারের কাউকেই ত সে সুখে রাখতে পারেনি। একরত্তি এই মেয়েটাকেও যদি সে সুখে রাখতে না পারে ত বৃথাই তার জীবন! বৃথাই সে পুরুষ হয়ে জন্মেছে।

মোনা দিনকতক দূরের একটা শহরে গিয়ে ভিক্ষে করতে আরম্ভ করলে। কিন্তু দিনকয়েক পরে দেখলে, ভিক্ষে তাকে আর কেউ দিতে চায় না। কেউ বা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, কেউ বা বলে, দিবিা শরীর রয়েছে, খেটে খাওগে বাবা।

মোনা কি যে করবে বুঝতে পারে না। কায়স্থের ছেলে, লেখাপড়াও শেখেনি যে কাজকর্ম করবে।

গ্রামের জমিদার বৃদ্ধ অজয় চৌধুরী মস্ত বড়লোক। এক একবার ভাবে, জমিদারকে গিয়ে ধরিগে! আবার ভাবে, এককালে এই জমিদারকে সে গ্রাহ্যও করেনি। কতবার তাঁর আদেশ অমান্য করেছে, এমন কি যখন সে জোয়ান ছিল, এই পৃথিবীটাকে সে অন্য চোখে দেখতো, তখন সে তাঁকে

একটু আধটু অপমানও করেছে। সেই লজ্জায় এখন সে তাঁর কাছে যেতেও পারে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে তাকে একদিন হলোই। জমিদারবাবু বাইরের ঘরে বসে ছিলেন, মোনা তার হাতের লাঠিটা মাটিতে নামিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ঢিপ কোরে একটি প্রণাম করলে।

অজয় চৌধুরী মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, কিরে? মোনা কি মনে কোরে?

মোনা বললে, বাবু একটা চাকরি-বাকরি দিন।

কেন? ডাকাতি করগে যা না।

মোনার চোখ দুটো ছল ছল করে এলো, বললে, আর লজ্জা কেন দিচ্ছেন কর্তা!

খানিক চুপ করে থেকে জমিদারবাবু বললেন, চাকরি করবি? বেশ, তবে কাল থেকে আমার চাপরাসীর কাজ কর!

মোনা হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরে এলো। বাড়ীতে ঢুকেই ডাকলে, দিদি!

রাণী ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালো।

মোনা বললে, কাল থেকে জমিদার বাড়ীতে চাকরি করবো দিদি! এবার আর তোর ভাবনা নেই। ভালো ভালো শাড়ী এনে দেবো…তুই যা চাইবি দিদি, তাই এনে দেবো।

আমার কিছুই চাই না দাদু, বলে রাণী চলো যাচ্ছিল, মোনা বললে, চলে যাচ্ছিস কেন ভাই, শোন! কিছু চাইনে? ভালো একটি বর যদি এনে দিই…

যাঃ-ও!

লজ্জায় এবার সে সত্যিই চলে গেল।

আনন্দে মোনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো!

দুই নাতনী ঠাকুদার পরমানন্দে দিন কাটছিল। মোনার সংসারে আর তেমন অভাব নেই। মাইনে যা পায় তাই দিয়ে দু'জনের বেশ চলে যায়।

জয়নগরের একটা বাঁধের দখল নিয়ে দুই জমিদারে বাধল একটা মামলা। এক তরফে আমাদের অজয় চৌধুরী, আর এক তরফে জয়নগরের জমিদার। বাঁধে জোর করে মাছ ধরিয়ে দখল নিতে হবে।

অজয় চৌধুরী মোনাকে ডেকে বললেন, মোনা পারবি ?

জমিদারবাবুকে একটি প্রণাম করে লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে মোনা উঠে দাঁড়ালো।

তারপর জনকতক জেলে সঙ্গে নিয়ে মোনা একাই গেল পুকুরের দখল নিতে।

প্রকাণ্ড বড় বড় পাঁচটা মাছ নিয়ে মোনা ফিরে এলো। জমিদার খুসি হয়ে তার দিকে তাকাতেই দেখলেন, তার কাপড়ে কাঁচা রক্তের দাগ, লাঠিটা রক্তে রাঙা হয়ে গেছে, একি! খুন-খারাপি হয়ে গেছে নাকি ?

হাসতে হাসতে মোনা বললে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এমন ত হয়েই থাকে বাবু। বেশি কিছু হয়নি, একটা ছোঁড়া মনে হলো যেন পড়ে গেছে।

পড়ে গেছে কিরে ?

একটা ছোঁড়া এসেছিল আমার মাথায় লাঠি চালাতে। জনপঞ্চাশেক এসেছিল বাবু, তা কেউ এগোলো না। শুধু ওই একটা ফাজিল ছোঁড়া বলে কিনা—রেখে দে তোর মোনা ডাকাত, বুড়ো হয়েছিস্ এখন আর তোর—আর বেশি কিছু বলতে দিইনি বাবু।

অজয় চৌধুরী জিগ্যেস করলেন, খুন করে ফেললি ?

মোনা বললে, আজ্ঞে না, খুন আমি আর করব না পিতিজ্ঞে করেছি। মাথায় মারিনি, খুন ঠিক হবে না, তবে হাত দুটো হয়ত গেছে।

চৌধুরী বললেন, তা বেশ করেছিস। যা কাপড়টা বদলে হাত পা ধুয়ে ফ্যাল।

কিন্তু তারপরের দিন বাধল এক মহা গণ্ডগোল! পুলিস এলো মোনাকে ধরে নিয়ে যেতে।

চৌধুরীমশাই অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু মোনা ডাকাত এ অঞ্চলে বিখ্যাত লোক। গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাকে চিনে ফেলেছে। পুলিশ শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু অজয় চৌধুরী জামিন দিয়ে সেইদিনই তাকে ছাড়িয়ে আনলেন।

মামলা চলতে লাগলো। অজয় চৌধুরী চেষ্টার ত্রুটি করলেন না, টাকাও বিস্তর খরচ করলেন। কিন্তু মোনাকে তো খালাস কিছুতেই করে আনতে পারলেন না। মোনার একমাস জেল হয়ে গেল।

মোনা ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল। একমাস মাত্র জেল, তারই জন্যে মোনা

আজ কিনা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। অবাক কাণ্ড। এরকম জেল তার কত হয়েছে। কোনদিন কেউ তাকে কাঁদতে দেখেনি।

সবাই বলতে লাগল, চিরদিন কি আর কারো সমান যায় রে বাবা। বুড়ো হয়েছে, আর কি সে জেলের কষ্ট সইতে পারে।

কিন্তু হায়, কেউ তার মনের কথা বুঝলে না। জেলের জন্যে সে কাঁদেনি, কেঁদেছে রাণীর জন্যে। কাঁদতে কাঁদতে সে জেলে গিয়ে ঢুকল।

একমাস মাত্র তিরিশটি দিন। দেখতে দেখতে কেটে গেল। মোনা গ্রামে ফিরে এলো। পাগলের মত ছুটতে ছুটতে সে তার বাড়ীর দরজায় এসে ডাকলে, দিদি। দিদিমণি! আমি এসেছি।

কিন্তু একি! কারও সাড়া না পেয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখে, দরজায় তালা বন্ধ। বাড়ীতে কেউ নেই, রাণী গেল কোথায়?

মোনা তখনি জমিদারের বাড়ীর দিকে ছুটল। অজয় চৌধুরী বাইরের ঘরে একলা বসে ছিলেন, উন্মাদের মত মোনা তার পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল, আমার দিদিমণি কোথায় গেল বাবু?

দিদিমণি? চৌধুরীমশাই হাসতে লাগলেন, বললেন, সে পালিয়েছে।

পালিয়েছে কি? মোনা তাঁর মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে বললে, হাসছেন যে?

দাঁড়া আসছি। বোস একটু ঠাণ্ডা হ। বলে চৌধুরীমশাই বাড়ীর ভিতর উঠে গেলেন।

মোনা হতভম্বের মত বসে রইলো। ভালো করে কিছুই বুঝতে পারলে না।

খানিক পরেই জমিদারমশাই-এর বদলে সেখানে এসে দাঁড়ালো রাণী।

রাণীকে দেখে মোনা চীৎকার করে উঠল, দিদি!

রাণীও তার কাছে ছুটে এলো, বললে, দাদু তুমি এসেছো? আমার জন্যে সেখানে খুব ভাবছিলে বুঝি?

পরস্পর মুখের পানে তাকিয়ে কেঁদে ভাসালে। তারপর কান্না থামলে, তাদের যে কত কথা।

মোনা দেখলে রাণী এখানে বেশ সুখে আছে। কেনই বা থাকবে না। একে জমিদারের বাড়ী, তার উপর ভালো করে দু'বেলা খেতে পায়। ভালো ভালো শাড়ী পরে, গয়না পরে—রাণী সেজেছে ঠিক রাণীর মত।

মোনা তার দিকে তাকিয়ে আর যেন চোখ ফেরাতে পারে না।

রাণী বললে, চল দাদু, এবার আমরা যাই।

মোনার যেন ধ্যান ভাঙল। বললে, কোথায় যাবি ভাই?

রাণী বললে, আমাদের বাড়ীতে।

আমাদের বাড়ীতে? কেন দিদি, এখানে ত বেশ সুখে আছিস।

রাণী কিন্তু জিদ ধরে বসলো, তা হোক দাদু, আমি তোমার কাছে থাকবো।

আমার কাছে? মোনা একটু হেসে বললে, আমার কাছে দু'বেলা পেটভরে যে খেতেও পাস না দিদি?

রাণী বললে, না দাদু, তা হোক তুমি চল।

মোনা কি করবে কিছু বুঝতে পারলে না। খানিক চুপ করে কি যেন ভেবে বললে, এক গ্লাস জল আনত ভাই। ভারি পিপাসা পেয়েছে।

রাণী ছুটল বাড়ীর ভেতর থেকে জল আনবার জন্যে।

বেশিক্ষণ যায়নি। জলের গ্লাস হাতে নিয়ে রাণী ফিরে এলো। এসে দেখে দাদু নেই।

দাদু! দাদু! কিন্তু কোথায় দাদু?

বর্ষাকাল। চারিদিক অন্ধকার, বাইরে তখন ঝমঝম করে বাদল নেমেছে।

এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় সে গেল?

গ্লাস হাতে নিয়ে দরজার কাছে অনেকক্ষণ রাণী দাঁড়িয়ে রইলো। মোনা তবু ফিরল না। গ্লাসটা নামিয়ে রাণী একলা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

ছোট্ট মেয়ে। কেন যে দাদু তার চলে গেল কিছু বুঝতে পারলে না।

কেন যে গেল, কি কষ্টে যে গেল, তা একমাত্র তার দাদুই জানলে আর জানলেন অন্তর্যামী।

রাণীর কাছে ফিরে যাবার জন্যে, আর একটিবার তাকে দেখবার জন্যে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল। কিন্তু তবু কিছুতেই সে ফিরতে পারলে না। ফিরতে পারলে না এই ভেবে, সে সাক্ষাৎ অমঙ্গল, সংসারের কোন মানুষই শুধু তার জন্যে সুখী হয়নি। তার কাছে থাকলে হয়ত তার রাণীরও কষ্টের আর অবধি থাকবে না। তার চেয়ে মূর্তিমান অভিশাপ যে, তার দূরে সরে যাওয়াই ভালো।

রাণীর স্থান রাজার বাড়ীতে—ডাকাতের বাড়ীতে নয়।

ভুতের গল্প

আমার নাতিরা বলেছিল তারা নাকি এক বন্ধু পেয়েছে।

'কোথায় পেয়েছিস ?,

তারা বলেছিল, 'পার্কে।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, দেখি না—আমার দুই নাতি বাচ্চু আর মুকুল টানতে টানতে নিয়ে আসছে এক বুড়ো ভদ্রলোককে।

লোকটির বয়স প্রায় সত্তোরের কাছাকাছি। মাথার চুল সব পাকা। মুখে দাঁত বলতে একটিও নেই। হাতে একটা লাঠি। সেই লাঠির ওপর ভর দিয়ে সুমুখের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে লোকটি এগিয়ে আসছে আমার বাড়ির দিকে। কোমরের কাছটা বাঁকা। লোকটি বোধহয় সোজা হয়ে হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

বাইরের ঘরে বসলো লোকটি।

আমার বাড়িতে এসেছে যখন, আমার নাতিদের বন্ধু, আমার একবার যাওয়া দরকার। কাছে গিয়ে বললাম, 'নমস্কার।'

লোকটি আমার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালো। বড় বড় দুটি চোখ। মুখে দাঁত নেই। কিন্তু ফোক্‌লা মুখের হাসিটি চমৎকার। হাসতে হাসতে বললে, 'নমস্কার।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী নাম আপনার?'

'নাম? আমার নাম ঝুঁকোবাবু।'

'ঝুঁকোবাবু? সে আবার কী রকম নাম?'

'কোমরটা সোজা করতে পারি না মশাই। ঝুঁকে ঝুঁকে চলি, তাই সবাই আমাকে ঝুঁকোবাবু বলে ডাকে।'

'ভাল নাম কী?'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'ভাল নাম ভুলে গেছি। আপনার নাতিরা আমার বাপের নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে।'

এই বলে ঝুঁকোবাবু হাসতে হাসতে বাচ্চুর মুখের দিকে তাকালে। বললে, 'কই রে, চা খাওয়াবি বলেছিলি যে!'

মুকুল বললে, 'আগে গল্প তারপর চা।'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'না। আগে চা, তারপর গল্প।'

চাকরকে ডেকে ঝুঁকোবাবুকে একপেয়ালা চা দিতে বললাম।

খুশীতে ঝুঁকোবাবুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'বাস্, এবার আপনি চলে যান এখান থেকে। আমার কারবার এই সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। বুড়োদের সঙ্গে আমি কথা বলি না।'

লোকটি পাগল কিনা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমাকে একরকম তাড়িয়েই দিলে ঘর থেকে। পাশের ঘরে গিয়ে বসলাম। তাদের কথাবার্তা সবই শুনতে পাচ্ছিলাম।

চাকর চা দিয়ে গেল।

বাচ্চু মুকুল—দুজনেই অধীর হয়ে উঠেছিল গল্প শোনবার জন্যে।

'এই তো চা এসে গেছে। বলুন এবার গল্প বলুন।'

তা হ্যাঁ, জানে লোকটা গল্প বলতে।

চা খেয়ে চোখ বুজে আপন মনেই বিড়বিড় করে মন্ত্র বলার মত কী যেন বললে ঝুঁকোবাবু। তারপর হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে যেন প্রণাম করলে।

'কাকে প্রণাম করলেন আপনি?'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'গল্পেশ্বরীকে।'

হোহো করে হেসে উঠলো বাচ্চু আর মুকুল। 'গল্পেশ্বরী ঠাকুর আছে নাকি? ধেৎ!'

'আছে, আছে। তবে আর বেশীদিন বোধহয় তিনি থাকবেন না আমাদের দেশে।'

'কেন ?

'তোমাদের যুগে আর কেউ তাঁকে ডাকবে না। গল্পেশ্বরী তাই পালিয়ে যাচ্ছেন দেশ ছেড়ে।'

বাচ্চু বললে, 'গেলেন তো বয়েই গেল। আপনার চা খাওয়া হয়ে গেছে, এবার গল্প বলুন।'

'শোনো তবে গল্প শোনো। এক যে ছিল রাজা—'

হাঁহাঁ করে উঠলো বাচ্চু মুকুল—দুজনেই।

'না না রাজার গল্প শুনবো না।'

'তাহলে রাণীর গল্প শোনো। রাণী একদিন রাজার সঙ্গে ঝগড়া করে বললে, আমি তোমার বাড়িতে থাকবো না। আমি চললাম।'

'তারপর ?'

'তারপর রাণী চলে গেল কোটালপুত্রের কাছে। বললে, তোমার কাছে আমি থাকবো।'

বাচ্চু বললে, 'না। কোটাল-ফোটাল চলবে না। ওসব সেকেলে গল্প। আজকালকার গল্প বলুন।'

'বেশ তবে আজকালকার গল্পই শোনো।'

ঝুঁকোবাবু হাত বাড়িয়ে তাকিয়াটা টেনে নিয়ে ভাল করে চেপে বসলো। বললে, 'আমি একটি মেয়েকে দেখেছিলুম—ভারী সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটির নাম ছিল গোপা। গোপার মা একদিন আমাকে ডেকে বললে, 'ঝুঁকোবাবু, পরশু সন্ধেবেলা আপনার নেমন্তন্ন আমাদের বাড়িতে।'

'কেন ? নেমন্তন্ন কেন ?'

গোপার মা বললে, 'গোপার বিয়ে।'

'কোথায় বিয়ে দিচ্ছ মা ? বর আসবে কোথেকে ?'

'বর্ধমান জেলার দেবগ্রাম থেকে।'

'শহরের মেয়ে পাড়াগাঁয়ে থাকতে পারবে তো ?'

'কী করবো বাবা, মেয়ের কপাল।'

মুকুল বললে, 'না। পাড়াগাঁয়ের গল্প শুনবো না। পাড়াগাঁ আমরা দেখি নি।'

বাচ্চু বললে, 'পাড়াগাঁ শুনেছি খুব নোংরা। সেখানকার লোকগুলো পুকুরের জল খায়। কেরোসিনের আলো জ্বালে। মাটির ঘরে থাকে। হ্যাক্ থু।'

মুকুল বললে, 'তার চেয়ে আপনি একটা ভূতের গল্প বলুন।'

ঝুঁকোবাবু হোহো করে হেসে উঠলো। বললে, 'ভূতের গল্প শুনে ভয় পাবি না তো?'

'না না ভয় আমরা পাই না, আপনি বলুন।'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'পাড়াগাঁয়ের ভূতের কথা তো শুনবি না। কলকাতার ভূতের কথাই শোন্। ওই যে দেখছিস এই রাস্তার ওপর ওই লালরঙের বাড়িটা—হঠাৎ শুনলাম ওই বাড়িতে ভূতের দাপাদাপি শুরু হয়েছে। বাড়িতে লোকজন কম। দোতলায় থাকে বাড়ির মালিক আর নীচের তলায় একঘর ভাড়াটে। অত্যাচার চলে বাড়ির মালিকের ওপর। বুড়ো মানুষ, রাত্তির কাল, বেচারা খেতে বসেছে, আর জানলা দিয়ে ঠিক সেই সময় একটা ঢিল এসে পড়লো। ঢিলটা এসে পড়লো একেবারে থালার ওপর। চেঁচিয়ে উঠলো অনন্ত বসাক। তার গিন্নী ছুটে এলো। গালাগালি দিতে লাগলো পাড়া-পড়শী সবাইকে। ভূত বলে কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। এ ঠিক মানুষের কাজ। কোনও দুষ্টু লোক হয়ত এই কাণ্ডটি করছে।

রোজ রাত্তিরবেলা এই রকম কাণ্ড কারখানা চলতে লাগলো। পাড়া-পড়শী সবাই বিরক্ত হয়ে উঠলো। আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘুমোচ্ছে সবাই, এমন সময় অনন্ত বসাকের বাড়িতে গোলমাল! ঝনঝন করে ভেঙে পড়েছে জানলার সার্সি। কোন্ দিক থেকে ঢিল আসছে কেউ কিছু ঠাহর করতে পারছে না। সবাই বললে, 'থানায় খবর দিন।'

অনন্ত বসাক গেল থানায়। ডায়েরি লিখিয়ে এলো।

দারোগাবাবু এলেন সরেজমিনে তদারক করতে। দেখেশুনে বলে গেলেন, 'দেখি কী করতে পারি।'

করতে তিনি কিছুই পারলেন না। এলোপাথাড়ি ঢিল সমানে পড়তে লাগলো! আগে শুধু রাত্রেই পড়ছিল এখন আবার দিনেও ঢিল পড়তে লাগলো।

তাজ্জব কাণ্ড!

মাঝে মাঝে অনন্ত বসাকের বাড়ির দরজায় পুলিসের জীপ গাড়ি এসে

দাঁড়ায়। দারোগাবাবু হেসে হেসে বলেন, 'কেমন? ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হয়েছে তো?'

অনন্ত বসাক হাত জোড় করে কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, 'না হুজুর, বন্ধ হয় নি এখনও।'

'হবে হবে—এইবার বন্ধ হয়ে যাবে দেখবেন।'

এই বলে তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করে দিয়ে চলে যান।

নীচের তলার ভাড়াটে ভদ্রলোক কোন্ এক ইস্কুলের পণ্ডিত। কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন। তিন চারটি ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী, পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে দিন কাটান। এতদিন এই ঢিল ছোঁড়ার ব্যাপারটা নিয়ে কোনও কথাই তিনি বলেন নি।'

এই পর্যন্ত বলে ঝুঁকোবাবু থামলো একবার। বললে, 'দাঁড়া একটা বিড়ি খেয়ে নিই।'

মুকুল বললে, 'আপনি বিড়ি খান?'

'হ্যাঁ রে বাবা, খাই। পয়সা থাকলে সিগ্রেট্ খেতুম।'

বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ঝুঁকোবাবু বললে, 'কাশীশ্বর বিদ্যারত্নর সঙ্গে একদিন আমার দেখা হল। জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ মশাই, আপনাদের বাড়িতে নাকি ঢিল পড়ছে?'

গম্ভীর মুখে বিদ্যারত্ন বললেন, 'হুঁ, পড়ছে। তবে আমার বাড়িতে নয়। পড়ছে অনন্ত বসাকের দোতলায়।'

বললাম, 'সেই বাড়িতেই তো আপনি থাকেন?'

'হ্যাঁ, আমি থাকি নীচের তলায়।'

'তাহলে তো ওই একই বাড়ি হল। ওপর তলা আর নীচের তলা। এবার যদি আপনার ঘরে পড়ে?'

'পড়বে না, পড়বে না, আমি জানি।' বিদ্যারত্ন বললেন, 'এ তো মানুষে ছুঁড়ছে না। ভূতে ছুঁড়ছে। আমি ব্রাহ্মণ মানুষ। তাছাড়া তন্ত্রমন্ত্র কিছু জানি।'

বললাম, 'বেশ তো, তন্ত্রমন্ত্র যদি জানেন তো তাড়িয়ে দিন ভূতটাকে।'

বিদ্যারত্ন তেড়ে মারতে এলেন আমাকে। বললেন, 'যা জানেন না তাই নিয়ে কথা বলতে আসছেন কেন? চেনেন আপনি অনন্ত বসাককে?'

বললাম, 'চিনি বইকি!'

উনি বললেন, 'চেনেন যদি তো বলুন ওঁকে—আমার সঙ্গে ওঁর যা কথা হয়েছিল সেই কথাটা রাখতে। তা যদি রাখেন তো আমি না হয় একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

গেলাম অনন্ত বসাকের কাছে। দেখলাম সে সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজন কাঁচের মিস্ত্রীর সঙ্গে দরদস্তুর করছে। আমাকে দেখেই বলে উঠলো, 'দেখুন না মশাই, কীরকম বিপদে পড়েছি। আমার বাড়িতে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে জানলার কাঁচগুলো সব ভেঙে দিচ্ছে। ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হচ্ছে না কিছুতেই।'

বললাম, 'বলেন তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

অনন্ত বসাক হাসলে। অদ্ভুত সে হাসি। হাসতে হাসতে বললে, 'আপনি পারবেন না ঝুঁকোবাবু। এ ঢিল তো মানুষে ছুঁড়ছে না। মানুষে ছুঁড়লে পুলিসে ধরে ফেলতো।'

'তাহলে কে ছুঁড়ছে আপনার মনে হয়?

'ভূতে। ভূতে ছুঁড়ছে আমি বুঝতে পেরেছি। কাল আমি গয়া যাচ্ছি, পিণ্ডি দিয়ে আসবো, তাহলেই বন্ধ হয়ে যাবে।'

কিছুদিন আগে শুনেছিলাম অনন্ত বসাকের এই বাড়িতেই দারুণ একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। বাড়িটা তখন সবেমাত্র নতুন তৈরী হয়েছে। অনন্ত বসাককে পাড়ার লোক ভাল করে চিনতো না তখন। তবে চিনতে তাকে দেরিও হল না। অনন্ত বসাকের বড় ছেলে ছিল পাঁড় মাতাল। দিনের বেলা দিব্যি ভাল মানুষটির মত বাড়ির রকে চুপচাপ বসে থাকে, আর রাত্তির হলেই শুরু হয় তার দাপাদাপি হট্টগোল। পাড়ার লোক মিটিং করলে, অনেকগুলো সহি দিয়ে থানায় দরখাস্ত পাঠালে। কিন্তু তার মীমাংসা হবার আগেই যাকে নিয়ে এত কাণ্ড অনন্ত বসাকের সেই ছেলে একদিন মারা গেল। কেমন করে মরলো কেউ কিছুই জানলো না। শুধু শুনলে সে মারা গেছে। মাসখানেক পেরোতে না পেরোতেই আবার আর একটা কাণ্ড। সেই ছেলের বিধবা বউ বাড়ির নীচের তলার একটা ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল।

অনন্ত বসাক বললে, 'এই সব ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি সেই তারই কাণ্ড। হতভাগী বেঁচে থেকেও সুখ দেয় নি, আবার মরেও জ্বালাচ্ছে। গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে এলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কাল আমি গয়া যাচ্ছি।'

অনন্ত বসাক গয়ায় গেল। ছেলে বউয়ের নামে পিণ্ডিও দিয়ে এলো। কিন্তু ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হল না।

কাশীশ্বর বিদ্যারত্নমশাই সেদিন বোধহয় তখন ইস্কুল থেকে ফিরছিলেন। আমাকে দেখেই থমকে থামলেন।

'কী হল ঝুঁকোবাবু? ঢিল ছোঁড়া থামলো? গয়ায় পিণ্ডিই দিক আর যাই করুক—থামবে না। আপনি সেই কথাটা বলেছিলেন অনন্ত বসাককে?'

বললাম, 'না মশাই, আপনার কথাটা বলি নি। বলবো এইবার।'

'বলবেন।'

বলেছিলাম অনন্ত বসাককে।

বলেছিলাম, 'তোমার এ ভূতটা দেখছি বড় সাংঘাতিক ভূত। তোমার নীচের তলার ভাড়াটে ওই যে কাশীশ্বর বিদ্যারত্নমশাই—'

নামটা শুনেই চেঁচিয়ে উঠলো অনন্ত বসাক। কথাটা আমাকে শেষ করতেই দিলে না। বললে, 'বিদ্যারত্ন না গুষ্টির মাথা। ব্যাটা পাজীর একশেষ। তিন তিনটি মাস বাড়ির ভাড়া দেয় নি। বলছি তোমাকে কিছু দিতে হবে না, তুমি উঠে যাও। তাও যাচ্ছে না।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তাঁর সঙ্গে আপনার কোনও শর্ত হয়েছিল?'

'ব্যাটা আপনাকে বলেছে বুঝি?'

'না। বিশেষ কিছু বলে নি। তবে লোকটা বিদ্বান-মানুষ, পণ্ডিত-মানুষ, তার ওপর তন্ত্রমন্ত্র কিছু জানে।'

'ছাই জানে। তবে শুনুন।'

এই বলে অনন্ত বসাক সব কথা আমাকে খুলেই বললে। বললে, 'এই বাড়ির যে ঘরটায় কাশীশ্বর থাকে ওই ঘরে আমার ছেলের বউ গলায় দড়ি দিয়েছিল। বাড়িতে দু'দুটো মানুষ মারা গেল তাই আমরা ভাবলাম নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে আমরা দোতলায় উঠে যাই। কিন্তু ভূতের বাড়ি বলে ভাড়া কেউ নিতে চায় না। শেষে ওই কাশীশ্বর রাজী হল। বললে, ভাড়া যদি দশ টাকা কমিয়ে দাও তাহলে আমি যেতে পারি। দিলাম দশ টাকা কমিয়ে। তার পর বলে কিনা আরও পাঁচ টাকা কমাও। তারপর বলে—আবার। এমনি করে করে পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার জায়গায় এখন হয়েছে তিরিশ টাকা। তাও তো তিন মাস একটি পয়সা

দেয় নি। ব্যাটা ভেবেছে কী? ভেবেছে বুঝি বিনা ভাড়ায় আমি ওকে থাকতে দেবো? কথ্‌খনো না। এবার আমি ওর নামে নালিশ করবো।'

ব্যাপারটা বুঝলাম সব।

অনন্ত বসাকের বাড়িতে ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হল না। কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন-মশাইএর কপালে সিঁদুরের ফোঁটাটা জলজল করতে লাগলো। গলায় দেখা গেল একটি রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিয়েছেন।

বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করেছেন তিনি। বিদ্বান মানুষ তাতে কোন সন্দেহই নেই। তার ওপর তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন বোধহয়। নইলে অনন্ত বসাকের ব্যাটার বঁউ ভূত হয়ে তাঁর কাছে বাঁধা পড়লো কেমন করে? শ্বশুর-শাশুড়ীর ওপর রাগ তার নিশ্চয়ই ছিল। গলায় দড়ি দিয়ে কেন মরেছে, তার সেই মৃত্যুর রহস্য আমার কাছে একেবারে অজানা। কিন্তু কোথাকার কোন্ এক কাশীশ্বর বিদ্যারত্নর ওপর তার এমন কিসের আকর্ষণ যার জন্যে সে তার হয়ে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে বুড়ো শ্বশুরকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে তুললে?

ভেবে ভেবে কিছুই যখন ঠিক করতে পারলাম না, তখন নিজেই একদিন উঠে পড়ে লেগে পড়লাম। থানায় গিয়ে দারোগাবাবুর কাছে আড্ডা জমালাম।

আগেকার দারোগাবাবু—যিনি এই অনন্ত বসাকের ব্যাপারটা সবই জানতেন—তিনি তখন বদলি হয়ে গেছেন। তাঁর জায়গায় যিনি এসেছেন, বড় রসিক মানুষ তিনি। নাম গগন গুপ্ত।

বললাম, 'সেই একটা কবিতায় পড়েছি—গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা—তেমনি একবার গর্জে উঠতে হবে আপনাকে।'

হাসতে হাসতে গগনবাবু বললেন, 'কেন বলুন তো?'

বললাম, 'থানা পুলিসের নাম শুনলে মানুষ ভয় পায় জানি। এবার ভূত-প্রেতগুলো আপনাদের ভয় করে কিনা দেখবো।'

'ভূতপ্রেত পাবেন কোথায় মশাই?'

বললাম, 'ধরে আনবো। একটা ভূতকে একদিন আপনার কাছে ধরে আনবো।'

গগনবাবু ভেবেছিলেন আমি হাসি রহস্য করছি। কথাটা বিশ্বাস করলেন না।

কিন্তু বিশ্বাস করলেন সেইদিন যেদিন সত্যিসত্যিই ভূতটাকে ধরলাম। ধরে নিয়ে গেলাম থানায়।'

বাচ্চু মুকুল দুজনেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'ভূত আপনি ধরলেন? কেমন দেখতে? ঠিক মানুষের মতন।'

'হ্যাঁ, ঠিক মানুষের মতন।'

'তারপর কী হল?'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'ভূত জব্দ হয়ে গেল। গগনের গর্জন আর দু-চারটে রুলের গুঁতো। বাস্, সব ঠাণ্ডা।'

বাচ্চু বললে, 'ভূতটাকে আর একদিন ধরুন। আমরা দেখবো।'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'সে কি আছে এ-পাড়ায়? ব্যাটা তো পুলিসের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে।'

মুকুল বললে, 'ব্যাটা বলছেন কাকে? ভূত তো অনন্ত বসাকের ছেলের বউ।'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'না রে না, ভূত হচ্ছে গিয়ে সেই কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন। মরা ভূত নয়, জ্যান্ত ভূত। সেই ব্যাটাই ঢিল ছুঁড়তো।

বাচ্চু বললে, 'এবার একটা সত্যিকারের ভূতের গল্প বলুন।'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'এই তো সত্যিকার ভূত। এই কাশীশ্বর বিদ্যারত্ন। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বাইরেটা একরকম, ভেতরটা আর-একরকম। কত রকমের ছদ্মবেশে কত ভূত যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার হিসেব নেই।'

হাঁ করে শুনছিল বাচ্চু আর মুকুল।

ঝুঁকোবাবু বললে, 'এরা কিন্তু পেঁচি ভূত। আবার আর এক রকমের ভূত আছে। তাদের হাঁ-টা এই এ-ত বড়। তারা বলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা-কিছু ভাল সব আমি নেব আমি খাব। তারাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।'

মুকুল বললে, 'তবে যে শুনেছি ভূতগুলো অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়— তাদের সহজে কেউ দেখতে পায় না।'

'হ্যাঁ সেইগুলোই মরা ভূত। তারা মানুষের মনের কোণে অন্ধকারে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে, সুবিধে পেলে সেইখান থেকে বেরিয়ে আসে, আবার সেইখানেই মিলিয়ে যায়। তারা মানুষের কোনও ক্ষতি করে না।'

মুকুল বাচ্চু দুজনেই বললে, 'সেইরকম ভূতের গল্প একটা শুনবো।'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'গল্পেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করবো। তিনি যদি অনুমতি দেন তো শোনাবো।'

'গল্পেশ্বরীর অনুমতি নিতে হবে কেন?'

ঝুঁকোবাবু বললেন, 'ডামাডোলের বাজার তো? সব জায়গায় সব গল্প বলতে নেই।
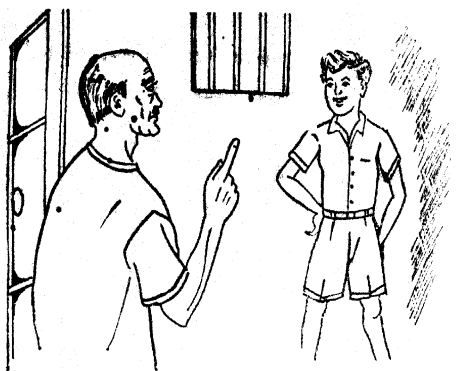
সত্যি কথা

এক

আদিনাথবাবু বুড়ো হয়েছেন। মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। মুখে একটিও দাঁত নেই; বয়স প্রায় সত্তোরের কাছাকাছি। হোহো করে হাসেন। হাসিটি বড় চমৎকার।

আর কেনই-বা হাসবেন না?

সুখের সংসার! ছেলে বউ আর বারো বছরের নাতি! ছেলে ব্যাঙ্কে চাকরি করে। চার শো টাকা মাইনে পায়।

বাড়িটা পুরনো। তা হোক। তিনখানা বড় বড় ঘর। ভাড়া মাত্র পঁচিশ টাকা। সেই পুরনো দিনের ভাড়াই চলছে। বাড়িওলা মানুষটি খুব ভাল। মাসের প্রথমে আসেন। ভাড়াটি নিয়ে বলেন, 'সবাইকার ভাড়া বাড়িয়েছি, কিন্তু আপনার ভাড়া বাড়াই নি।'

আদিনাথবাবু হাসতে হাসতে বলেন, 'আপনার দয়া। ছেলে যদি হাজার টাকা মাইনে পায় তবু সে এই বাড়িতেই থাকবে। মরবার সময় ছেলেকে সেই কথা আমি বলে যাব।'

'এখনই মরবেন কি মশাই? ছেলে-বউ নাতি-নাতনী নিয়ে সংসারে থেকে আনন্দ করুন আরও কিছুদিন!'

আদিনাথবাবু বলেন, 'না মশাই, বেশী লোভ ভাল নয়। ভগবানের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করছি—এইবার আমাকে ছুটি দিন।'

বারো বছরের নাতি জীবনানন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল দাদুর কথাগুলো।

বাড়িওলা চলে যেতেই বললে, 'তুমি এত মরবো মরবো কেন বল দাদু? মরা কি ভাল?'

দাদু বললে, 'হ্যাঁ ভাই, আমার এবার মরাই ভাল। বুড়ো মানুষগুলো সংসারের বোঝা।'

জীবনানন্দ বলে, 'তুমি বোঝা কেন হবে দাদু? মাসে মাসে তুমি তো একশ টাকা পেনসেন্ পাও!'

ছেলেটা সে-খবরও রাখে। বুদ্ধিমান ছেলে।

দাদু জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার বাবা কত মাইনে পায় বল তো দেখি?'

ছেলেটা চুপ করে থাকে। খানিক ভেবে বলে, 'তা জানি না। তবে চার পাঁচ শ' টাকা নিশ্চয়ই পায়।'

'কেমন করে বুঝলে?'

'তা নইলে এত খরচ আমাদের চলছে কেমন করে?'

কথাটা শুনে দাদুর আনন্দ যেন আর ধরে না! এইটিই তিনি চেয়েছিলেন। ছেলে রোজগার করছে। নাতি লেখাপড়া শিখছে। বড় হবে। বিদ্বান হবে। রোজগার করবে। সংসার ধরে নেবে। তাঁর আর চিন্তা করবার কিছু নেই।

আদিনাথ মৃত্যুর জন্য তৈরী করছেন নিজেকে।

সকালবেলা খবরের কাগজ পড়া তাঁর চিরকালের অভ্যাস। বাংলা কাগজ একখানা আসে তাঁর বাড়ীতে। কাগজখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। আজকাল প্রায়ই মানুষের মৃত্যুসংবাদ থাকে। কেউ-বা কথা বলতে বলতে মারা গেছেন। কেউ-বা অজ্ঞান হয়ে গেছেন, তারপর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। এইগুলি তাঁর প্রিয় সংবাদ।

বউমাকে ডাকেন। ডেকে শোনান। বলেন, 'এই রকম মৃত্যু খুব ভাল বউমা। 'থ্রম্বসিস্' বলে একটা রোগ এসেছে। খুব সুন্দর। কোনও জ্বালা নেই যন্ত্রণা নেই, বিছানায় পড়ে থাকা নেই, কারও সেবা-শুশ্রূষা নিতে হয় না। ফট্ করে পড়লো আর মলো।'

বউমা বলে, 'খালি খালি ওসব কী ভাবছেন বলুন তো বাবা! রাখুন, কাগজখানা রাখুন তো দেখি।'

এই বলে কাগজখানা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলে, 'যান, চান করে তাড়াতাড়ি পূজো সেরে নিন। আপনি খেলেই আমার ছুটি।'

আপিসে যখন চাকরি করতেন পূজো করবার সময় পেতেন না

আদিনাথবাবু। আজকাল রোজই একবার করে চোখ বুজে ধ্যান করতে বসেন। ফুলের দরকার হয় না, পূজোর কোনও মন্ত্রও বলেন না। শুধু চোখ বুজে হাতজোড় করে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা করেন, 'যাদের রেখে গেলাম তাদের তুমি সুখে-শান্তিতে রেখো। আর আমি কিছুই চাই না। এবার আমার মৃত্যু দাও।'

তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন।

প্রণাম করে নাতিকে ডাকেন। বলেন, 'এইখানে প্রণাম কর ভাই। ভগবানে বিশ্বাস রেখো।'

জীবনানন্দ হাতজোড় করে চোখ বুজে মনে মনে কী যেন বলে। তারপর প্রণাম করে।

আদিনাথবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'কী বললে ভাই?'

জীবনানন্দ বলে, 'বললাম—ইচ্ছা করলে তুমি সবই করতে পারো—তুমি সর্বশক্তিমান। তুমি আমাদের সুখে রেখো!'

আদিনাথবাবু বলেন, 'হ্যাঁ ভাই, ভগবানের কাছে রোজ একবার করেও অন্ততঃ প্রার্থনা কোরো। মানুষের সব প্রার্থনাই তিনি পূর্ণ করেন।'

এমনি করেই তাদের দিন চলছিল।

চলতে চলতে হঠাৎ একদিন আদিনাথবাবুর ছেলে সীতানাথ বড় অসময়ে আপিস থেকে বাড়ী ফিরে এলো।

'কী রে ছুটি হয়ে গেল নাকি? এ সময়ে বাড়ি এলি যে?'

সীতানাথ বললে, 'না বাবা শরীরটা তেমন ভাল নেই।'

'কী হয়েছে দেখি!'

আদিনাথ তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন—গা গরম, সামান্য জ্বর হয়েছে। রাত্রে জ্বর বাড়লো। পরের দিন আপিস যাওয়া হলো না। আদিনাথ নিজে গিয়ে ছুটির দরখাস্ত দিয়ে এলেন ব্যাঙ্কে। ফেরার পথে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ঢুকলেন।

ডাক্তার দেখলেন সীতানাথকে। বেশ ভাল করে দেখলেন। জ্বর একশো তিন। ভুল বকছে সীতনাথ। ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিলেন। মাথায় জলপটি দিতে বললেন।

আদিনাথ ডাক্তারকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন দেখলে বাবা? জ্বরটা কি খারাপ?'

ডাক্তারের কেমন যেন চিন্তিত মুখের চেহারা। বললেন, 'এখনও ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কাল আর একবার এসে দেখে যাব।'

ডাক্তার এলেন তার পরের দিন। সীতানাথের রক্ত নিলেন পরীক্ষা করবার জন্যে। পরীক্ষার ফল খুব ভাল বলে মনে হল না।' মুখখানি তাঁর শুকিয়ে গেল। কথাটা তিনি বললেন না কাউকে।

না বললেও রুগীর অবস্থা দেখে বুঝতে পারলে সবাই। আদিনাথ রোজ যেখানে বসে বসে আহ্নিক করেন সেইখানে গিয়ে বসলেন। অনেকক্ষণ ধরে ধ্যান করলেন। কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করলেন ভগবানের কাছে। বললেন, 'সীতানাথকে সুস্থ করে দাও ঠাকুর। এই আমার শেষ প্রার্থনা।'

জীবনানন্দ ছেলেমানুষ। নিজে গিয়ে ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ নিয়ে এলো। ইস্কুল কামাই করলে চলে না। তাই সে চারটি খেয়েদেয়ে ইস্কুলেও গেল। কিন্তু সব সময়েই তার মনে হতে লাগলো ভগবানের কথা। মনে মনে ক্রমাগত প্রার্থনা করতে লাগলো—'তুমি আছ কিনা আমি জানি না। সত্যিই যদি থেকে থাকো তো বাবাকে তুমি ভাল করে দাও।'

কিন্তু কারও কোনও প্রার্থনাই তিনি শুনলেন না। রুগীর অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে লাগলো। আট দিনের দিন গভীর রাত্রে কলকাতা শহরের এই শহরতলিটা যখন প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে সেই সময় সীতানাথ মারা গেল।

বৃদ্ধ আদিনাথ তাঁর ঠাকুরের কাছে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন। বউমার চোখের সামনে সারা পৃথিবীটাই যেন অন্ধকার হয়ে এলো। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে পর্যন্ত পারলে না। ছেলেটা ঘুমোচ্ছে।—ঘুমোক।

ঘড়িতে ঠিক ক'টা বাজলো বুঝতে পারলে না। সীতানাথের হাত-ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। দম দেওয়া হয়নি।

দুই

কলকাতা শহরটা আগেও যেমন চলছিল এখনও ঠিক তেমনিই চলছে। তেমনি লোকজন, তেমনি গোলমাল, তেমনি সব। সূর্য উঠছে, সকাল হচ্ছে, সকাল গড়িয়ে দুপুর হচ্ছে, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা, তারপর রাত্রি।

রাত্রির পর আবার দিন।

কিন্তু যে রাত্রি নামলো আদিনাথের সংসারে, সে রাত্রি বুঝি প্রভাত হবার নয়।

লোকজন আসতে লাগলো আদিনাথবাবুর কাছে।

'ভগবানের কিরকম অবিচার দেখুন।' এই সব দেখেশুনে মনে হয় বুঝি ভগবান নেই।'

আদিনাথবাবু বলেন, 'না না, তা বলবেন না। ভগবান আছেন বইকি! এটি হলো শুধু আমার পাপের কর্মভোগ। পূর্বজন্মে অনেক পাপ করেছিলাম আমি।'

বাড়ির মালিক এলেন মাসের প্রথমে—ঠিক যেমন আসেন তেমনি। আদিনাথবাবু পঁচিশটি টাকা এনে তাঁর হাতে দিতে গেলেন।

টাকা কিন্তু তিনি নিলেন না। আদিনাথবাবুর হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাড়া নিতে আমি আসি নি আদিনাথবাবু, আমি এসেছি আপনাকে একটা কথা বলতে।'

'কী কথা, বলুন।'

'আপনি বলেছিলেন—এ-বাড়ী আপনি কখনও ছাড়বেন না। সেই কথাটি আপনাকে রাখতে হবে।'

আদিনাথবাবু বললেন, 'কেমন করে রাখি বলুন। আমি ভেবেছি—আট দশ টাকা ভাড়ায় কোথাও কোনও বস্তিতে যদি একখানা ঘর পাওয়া যায় তো সেইখানে উঠে যাব।'

বাড়িওলা বললেন, 'তা হয় না আদিনাথবাবু। কলকাতায় আমার অনেকগুলি বাড়ি আছে, ভাড়াও আমি কম পাই না। তাই আমি ঠিক করেছি, আপনার নাতি যতদিন না বড় হবে ততদিন এই বাড়ির ভাড়া আমি নেবো না।'

আদিনাথবাবুর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না। বাড়িওলার হাত দুটো চেপে ধরে তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন, চোখ দিয়ে টপটপ করে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

আদিনাথবাবু সেদিন তাঁর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে গিয়ে কেঁদে ভাসালেন।

'তোমার দয়ার সীমা নেই প্রভু! তুমি করুণাময়!'

জীবনানন্দর ইস্কুলের বেতন সাত টাকা মাসে। ফ্রি স্টুডেন্টশিপের জন্য একটি দরখাস্ত করেছিলেন আদিনাথবাবু।

সেদিন জীবনানন্দকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে গেলেন হেডমাস্টার

মশাইএর সঙ্গে। আদিনাথবাবুকে দেখেই হেডমাস্টার মশাই বলে উঠলেন, 'আপনাকে তো আমি তখনই বলেছি—হবে না। বৃদ্ধ মানুষ আপনি কেন মিছেমিছি এলেন বলুন তো কষ্ট করে?'

আদিনাথবাবু বললেন, 'মাসে মাসে সাতটা টাকাও যদি বাঁচতো, আমার একটু সুবিধে হতো।'

হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'কিন্তু আমাদেরও তো একটা সুবিধে অসুবিধে আছে। এটা তো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়, এটা বিদ্যালয়। অনেক ছেলেকে এখানে বিদ্যাদান করতে হয়।'

জীবনানন্দ বললেন, 'দাদু, চল।'

আদিনাথবাবু হয়ত আরও দু'বার অনুরোধ করতেন, কিন্তু জীবনানন্দ তাঁকে আর কিছু বলতে দিলে না। জোর করে বাড়িতে নিয়ে এলো।

বউমা জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হলো বাবা?

জীবনানন্দ বললে, 'কী আবার হবে? যা হবার তাই হলো।'

আদিনাথবাবু বললেন, 'রাগ কেন করছো ভাই? ভগবান আছেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তিন

কয়েকদিন ধরে একজন জ্যোতিষী আনাগোনা করছিল আদিনাথবাবুর কাছে।

সেদিন সে একটা মাদুলি দিলে আদিনাথবাবুকে। বললে, 'মঙ্গলবার সকালে স্নান করে এইটি আপনি ধারণ করবেন। আপনার যে গ্রহদোষ আছে সেইটি কেটে যাবে।'

আদিনাথবাবু বললেন, 'আর সেই যে সেই পরমায়ুর কথা আপনি বলছিলেন—'

জ্যোতিষী বললে, 'গ্রহদোষটা কেটে যাবার পর—বলেছি তো শান্তিযজ্ঞ করলে আপনি আশি বছর বাঁচবেন।'

মনে মনে আদিনাথবাবু হিসেব করে দেখলেন—তিনি যদি আশি বছর বাঁচেন তাহলে জীবনানন্দ তখন বড় হয়ে উঠবে—রোজগার করব সংসার চালাতে পারবে। সুতরাং আশি বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার তাঁর একান্ত প্রয়োজন। যে-মানুষ একদিন মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন, সেই মানুষটি

আজ জ্যোতিষীর হাতে ধরে অনুরোধ করলেন, 'দয়া করে এই কাজটি আপনাকে করে দিতেই হবে। আমি আরও কিছুদিন বাঁচতে চাই।'

জ্যোতিষী বললে, 'শান্তিযজ্ঞ করবার খরচ তো অনেক। সে-টাকা আপনি দিতে পারবেন না জানি। তা হোক, আমি ছোটখাটো করে যজ্ঞটা আমার আশ্রমেই করে দেবো। আপনি এখন আমাকে পাঁচটা টাকা অন্ততঃ দিন।'

মাত্র পাঁচটি টাকা! চিন্তিত হলেন আদিনাথবাবু। মাত্র একশটি টাকা পেন্‌সেনের ওপর নির্ভর। লঘু আহার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, তাই তিনি রাত্রে আজকাল চারটি মুড়ি খান। বিধবা বউমার তো একবেলা উপবাস। তাও চলছে না।

এখন এই পাঁচটি টাকা জ্যোতিষীকে তিনি দেন কেমন করে?

হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো অনেকদিন আগে কিছু ধর্মগ্রন্থ তিনি কিনেছিলেন। বইগুলি পড়া তাঁর শেষ হয়ে গেছে। এখন আর সেগুলি পড়েন না। সেই বইগুলি বেচে ফেললে পাঁচ টাকার কিছু বেশীই পাওয়া যাবে।

আদিনাথবাবু সেই বইগুলি খুঁজতে লাগলেন। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে দেখলেন—পেলেন না। উঁচু একটা তাক ছিল দেয়ালের গায়ে। চৌকিটা দেয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর চড়ে তাকটা হাতড়াতে লাগলেন। ধুলোয় ভরতি পুরনো কতকগুলো কাগজ ছাড়া আর কিছু নেই। কোথায় গেল বইগুলো?

জীবনানন্দ বোধকরি ইস্কুলে যাচ্ছিল। দাদুর অবস্থা দেখে দোরের কাছে থমকে দাঁড়ালো।

—'ওখানে কী খুঁজছো দাদু?'

আদিনাথবাবু বললেন, 'আমার কতকগুলো বই ছিল—খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কী বই?'

'ধর্মগ্রন্থ।'

জীবনানন্দ হেসে বললে, 'বুঝেছি। সেই 'ঈশ্বর-দর্শন' না কী-সব গাঁজাখুরী আজগুবি কতকগুলো বই ছিল তো?'

আদিনাথবাবু বোধকরি রাগ করলেন। চৌকি থেকে নেমে এলেন জীবনানন্দর কাছে। গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'ছি ছি, ঈশ্বর-দর্শনকে তুমি গাঁজাখুরী আজগুবী বলছো দাদু?'

জীবনানন্দ বললে, 'হ্যাঁ বলছি। কী হবে সে বইগুলো?'

'ছিল দরকার।'

জীবনানন্দ বললে, 'সেগুলো আমি বেচে দিয়েছি সাত টাকায়। আমার ইস্কুলের মাইনে দিয়েছি।'

আদিনাথবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেশ করেছ। কিন্তু ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না ভাই।'

জীবনানন্দ তার দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমাকে বলছো? অথচ নিজে তুমি সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছো দাদু।'

'কেমন করে জানলে?'

জীবনানন্দ বললে, 'যেদিন থেকে দেখছি তুমি ওই ভণ্ড জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করে বসেছ, সেইদিন থেকে জেনেছি—ঈশ্বরে বিশ্বাস তোমার নেই।'

বলেই জীবনানন্দ ইস্কুলের দিকে চলে গেল।

আদিনাথবাবুর মাথাটা তখন ঘুরে গেছে। দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবলেন বুঝি ছেলেটা সত্যি কথাই বলেছে।

ঝুঁকোবাবুর গোঁফ নেই

ঝুঁকোবাবু গল্প বলে চমৎকার। সব কিন্তু শিকারের গল্প।

পাশের বাড়ির কণা, বাচ্চু, মুকুল—ছোট ছোট ইস্কুলের ছেলে ঝুঁকোবাবুর কাছে গল্প শুনতে আসে। সেদিনও এসেছিল।

ঝুঁকোবাবু ঝুঁকে ঝুঁকে চলে।

ঝুঁকে ঝুঁকে চলে বলেই তার নাম ঝুঁকোবাবু।

ঝুঁকোবাবুর কোমরের কাছটা বাঁকা।

কেউ যদি বলে, 'তোমার কেন এমন হলো ঝুঁকোদা?'

ঝুঁকোবাবু বলে, 'বাঘে কামড়েছিল রে ভাই, বাঘে কামড়েছিল। রয়েল বেঙ্গল টাইগার।'

'রয়েল বেঙ্গল টাইগার কোথায় পেলে?'

'সুন্দরবনে।'

'সুন্দরবনে তুমি বুঝি বাঘ মারতে গিয়েছিলে?'

ঝুঁকোবাবু বলে, 'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। চিরকাল তো বাঘই মারলাম।'

'তোমার ভয় করে না ঝুঁকোদা?'

'ভয়!' ঝুঁকোবাবু সোজা হবার চেষ্টা করে রুখে ওঠে।

'ভয় কাকে বলে আমি জানি না। ভয় যারা করে তারা বাংলা বাঘ মারে না, ইংরেজী বাগ মারে। 'বি, ইউ, জি—বাগ্।'

কণা, বাচ্চু, মুকুল—তিনজনেই হো হো করে হাসতে থাকে।

'হাসিসনে ভাই হাসিসনে। তোরা ছেলেমানুষ, বাঘ তোরা চোখেই দেখিসনি, তোরা বাঘ শিকারের মর্ম কি বুঝবি?'

মুকুল বলে, 'বাঘ দেখিনি মানে? চার-চারটে বাঘ দেখেছি। সেই যে সার্কাস হয়েছিল এই মাঠে—'

বাচ্চু বলে, 'চিড়িয়াখানায় সেদিন সাদা বাঘ দেখে এসেছি না?'

ঝুঁকোবাবুর এইবার হাসবার পালা। হাসতে হাসতে ঝুঁকোবাবু বললে, 'তোর চিড়িয়াখানার বাঘ আর বনের বাঘে অনেক তফাত।'

এই বলে ঝুঁকোবাবু তার পাইপে তামাক পুরতে লাগলো।

ঘরের দেয়ালে একটা ছবি টাঙানো ছিল। কণা অনেকক্ষণ থেকে সেই ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

'কী দেখছিস? আমার ওই ছবিটা?'

দেশলাই জেলে পাইপের তামাকে আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লে ঝুঁকোবাবু। বললে, 'যে-বাঘটার ওপর পা রেখে আমি দাঁড়িয়ে আছি ওটা একটা বাচ্চা চিতাবাঘ। বড় বড় বাঘের ছবিগুলো কে কোথায় নিয়ে চলে গেছে আর ফিরে দেয়নি।'

কণা বললে, 'এটা তোমার ছবি নয় ঝুঁকোদা। মনে হচ্ছে যেন অন্য লোক।'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'দূর বোকা, ওটা আমারই ছবি। রাঁচির লোয়ার ঘাঘ্‌রিতে ওই বাঘটা আমি মেরেছিলাম। আমার তখন বড় বড় গোঁফ ছিল তাই চিনতে পারছিস না।'

কণা একবার ঝুঁকোবাবুর মুখের দিকে একবার ছবিটার দিকে তাকাতে তাকাতে বললে, 'একেবারে চেনা যাচ্ছে না। গোঁফদুটো কিন্তু চমৎকার ছিল। কেটে ফেললে কেন?'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'একটা শিম্পাঞ্জির বাচ্চার জন্যে।'

কণা, বাচ্চু, মুকুল—তিনজনেই শিম্পাঞ্জির নামে লাফিয়ে উঠলো।—'সে আবার কি রকম?'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'সে এক ভারী মজার গল্প, শুনবি নাকি?'

'হ্যাঁ শুনবো।'

'শোন্ তবে।'

বলেই সে তার পাইপে বার-কতক টান দিয়ে বলতে শুরু করলে—

বাঘ মেরেছি অনেক। ছোটয়-বড়য় তা প্রায় কুড়িটার কম নয়।

'বাঘ মেরেছি, হরিণ মেরেছি, কুমির মেরেছি, সাপ মেরেছি'; হঠাৎ একবার সিংহ মারবার শখ চাপলো মাথায়।

সিংহ শিকার করতে হলে আফ্রিকার জঙ্গল ছাড়া উপায় নেই।

আফ্রিকা—আফ্রিকাই সই! চল্ আফ্রিকা!

নাম-করা শিকারী বলে ব্রিটিশ-গভর্নমেণ্টে দেওয়া ওয়ার্লডের পাসপোর্ট আমার কাছেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে দিলাম লিওপোল্ড্ভিলে। সেখানকার হাণ্টার্স এসোসিয়েসনের সেক্রেটারীকে জানিয়ে দিলাম—আমি কঙ্গোর জঙ্গলে সিংহ শিকারে যাচ্ছি। তাঁবু থেকে আরম্ভ করে, যাবতীয় সরঞ্জামসমেত একটি দল ঠিক করে রাখো।'

বাচ্চু জিজ্ঞাসা করে বসলো, 'সব ঠিক করে রেখেছিল?'

'রাখবে না? ওর বাপকে রাখতে হবে। আমি হলাম গিয়ে ইণ্ডিয়ার রিপ্রেজেন্‌টেটিভ্। এসোসিয়েসনের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট্।'

বলেই পাইপ টানতে লাগলো ঝুঁকোবাবু।

কেণা বললে, 'তারপর?'

ঝুঁকোবাবু ভাল করে চেপে বসলো। বললে, 'তখন তো আর এরোপ্লেন ছিল না। এখান থেকে বুলেট আর টোটায় থলে ভরতি করে বন্দুক, পিস্তল আর ছোরা নিয়ে ধরলাম বম্বে মেল। বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়ে সোজা দার-এস-সালাম বন্দরে। তারপর লিওপোলড্ভিলে। সেখানে দু'দিন বিশ্রাম করে দলবল নিয়ে ঢুকলাম গিয়ে কঙ্গোর গভীর জঙ্গলে। সে জঙ্গল যে কি রকম—তোরা এখান থেকে কল্পনাও করতে পারবি না। দিনের বেলাও টর্চ জেলে পথ চলতে হয়। পথ কোথাও আছে, কোথাও নেই। গাছে গাছে নানা রকমের রঙ-বেরঙের পাখি, বড় বড় সাপ, কত রকমের কত জন্তু-জানোয়ার।

প্রথম দিনে বেশী দূরে গেলাম না। মাইল চারেক দূরে ফাঁকা একটু জায়গা দেখে তাঁবু ফেললাম। রাত্রে পাহারার ব্যবস্থা। সবাই একসঙ্গে ঘুমোলে চলবে না। কতক ঘুমোবে, কতক বন্দুক হাতে নিয়ে পাহারা দেবে। আবার ওরা যখন জাগবে, এরা তখন ঘুমোবে।

ঘুম কি সহজে আসে নাকি?

বিশ্ববিখ্যাত আফ্রিকার জঙ্গল। পশুরাজ সিংহের রাজত্ব।

সিংহ কিন্তু তখনও আমরা একটিও দেখিনি।

কাছেই একটা নদীর মত খাল এঁকেবেঁকে কোথায় কোন্‌দিকে চলে গেছে কে জানে। পরের দিন সকালে দেখলাম নদীটা কুমিরে ভরতি।

ছোট বড় নানারকমের কুমির। কেউ-বা জলে ভাসছে, আবার কতকগুলো দেখলাম নদীর তীরে পলিমাটির ওপর দিব্যি চুপটি করে শুয়ে আছে। ছোট ছোট নানারকমের পাখি তাদের গায়ের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছে! একটা কুমির হাঁ করে দাঁত বের করে শুয়ে আছে, আর একটা পাখি নির্বিবাদে বসে বসে তার দাঁত খুঁটে দিচ্ছে।

আফ্রিকার মতন এমন সুন্দর দেশ পৃথিবীতে আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। সুন্দরও যত, ভয়েরও তত।

দূরে দেখলাম অনেকগুলো জেব্রা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গায়ে ডোরাকাটা দাগ। দেখতে ঠিক ঘোড়ার মত। 'এরা পোষ মানে না। নইলে ঠিক ঘোড়ার মত কাজ করতে পারতো।

হঠাৎ সিংহের গর্জনে সারা জঙ্গলটা যেন থর থর কেঁপে উঠলো।

ওই তো সিংহের ডাক।

আমার সঙ্গে যে আফ্রিকান যুবকটি ছিল—জাতে ক্রিশ্চান, নাম ফুচুম্বা। ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, গায়ের রং কালো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার ভয় করে না ফুচুম্বা?'

ফুচুম্বা হেসে বললে, 'নো। আমরা এইখানে জন্মেছি! বাবা মরেছে সিংহ মারতে গিয়ে! আমি কিসে মরবো জানি না।'

বলতে বলতে সে তার রাইফেল ধরলো।

দেখলাম সুমুখে একটা টিলার ওপর থেকে প্রকাণ্ড একটা সিংহ লাফিয়ে পড়েছে একটা জেব্রার ঘাড়ের ওপর। জেব্রাটা ঝটকা মেরে সিংহটাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। দু' পা তুলে ক্রমাগত লাফাচ্ছে।

আমিও বন্দুক তুলে ধরলাম। দেখতে দেখতে আরও দু'তিনজন বন্দুক নিয়ে এসে দাঁড়ালো আমাদের কাছে।

কিন্তু সুবিধে হচ্ছে না। স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে না কেউ। অন্য জেব্রাগুলো যে যেদিকে পেরেছে ছুটে পালিয়েছে।

ফুচুম্বা আপন মনেই বলে চলেছে, 'দিজ্ ব্লাডি লায়ন্স্ আর মাই বেস্ট্ এনিমিজ্। দে হ্যাভ্ কিল্ড্ মাই ফাদার। নাও ইউ ডেভিল্—

জেব্রাটা উলটে পড়েছে মাটির ওপর। তার গলাটা কামড়ে ছিঁড়ে, দিয়ে সিংহটা যেই মুখ তুলে তাকিয়েছে আমাদের দিকে, ফুচুম্বার রাইফেল্ গর্জন করে উঠলো—গুড়ুম্।

শব্দটা প্রতিধ্বনিত হলো। গাছে গাছে পাখিদের কোলাহল বেড়ে গেল।

গুলি খেয়ে সিংহটা উঠে দাঁড়িয়েছে। দেখতে পেয়েছে আমাদের। জেব্রাটাকে ছেড়ে দিয়ে এক লাফে একেবারে ফুচুম্বার সুমুখে। ঠিক সময়ে সরে না গেলে আজ আর তার রক্ষা ছিল না। একসঙ্গে তিনটে রাইফেল গর্জে উঠলো। আমার বুলেট তার কণ্ঠনালী ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। একটা লেগেছে তার পেটে, একটা মাথায়।

এগিয়ে গেলাম সিংহটার কাছে। কেশর রয়েছে তার ঘাড়ে। হ্যাঁ পশুরাজের মত চেহারা সত্যিই! একটা পা তখনও তার থর থর করে কাঁপছে। গলগল করে কাঁচা রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা।

আমাদের দলের একজন লোক পকেট থেকে কাঁচি বের করে সিংহের কেশরগুলো কাটতে লেগে গেল। কাটে আর পকেটে পোরে।

হুকুম দিলাম, 'তাঁবু ওঠাও এখান থেকে।'

'কেন?'

বললাম, 'সিংহ কখনও একা থাকে না। জেব্রাটাকে খেতে এসে যখন দেখবে তাদের দলপতি মারা গেছে তখন একসঙ্গে ওরা আমাদের চার্জ করবে।'

ভাত রান্না হয়ে গিয়েছিল। ভাত আর আলুসেদ্ধ। বোতলে পোরা আচার আর চাটনি দিয়ে তাই যেন অমৃত।

সিংহের মৃতদেহ পড়ে রইলো সেইখানে। আমরা এগিয়ে গেলাম।

জঙ্গলের ভেতরটা দিনের বেলাও অন্ধকার। টর্চ জেলে গাছ কেটে কেটে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, সময় দেখছি হাতের ঘড়িতে।

বেলা পাঁচটা। কফি খেতে হবে। কোথায় এসেছি জানি না। জায়গাটা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাঁদিকে খাড়া একটা পাহাড় উঠে গেছে। বললাম, 'খাটাও তাঁবু। এইখানেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।'

ফুচুম্বা রাজী হচ্ছিল না। বলছিল, 'এখানে হাতির পাল যদি থাকে তো বিপদে পড়তে হবে।'

বললাম, 'কঙ্গোর জঙ্গলে বিপদ নেই কোথায়? আমি যখন তোমাদের সঙ্গে আছি নির্ভয়ে থাকতে পারো।'

তাঁবু খাটানো হচ্ছে, আমরা একটা গাছের তলায় বসে বসে গল্প করছি, এমন সময় বিকট একটা চিৎকার!

'কি হলো?'

দলের একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে জানালে—'ওই দেখুন—পিগ্‌মি।'

লোকটা হাঁপাচ্ছে।

—'পিগ্‌মি তো হয়েছে কি?'

লোকটা বললে, 'ওদের দেখে আমাদের দলের একজন কুলি ছুটে পালাতে গিয়ে খাদে পড়ে গেছে।'

এমনি সব বিপদের সময় বোকার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে নেই। বললাম, 'তাঁবু থেকে চারজন জোয়ান আর দড়ির ল্যাডারটা নিয়ে এসো আমার সঙ্গে।'

পাহাড়ের মত উঁচু ঢিপিটার ডানদিকে মস্ত বড় একটা খাদ। দূরে থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই। গিয়ে দেখি—লোকটা খাদের নীচে পড়ে গিয়ে আফ্রিকান ভাষায় 'হেল্‌প্‌' 'হেল্‌প্‌' বলে চেঁচাচ্ছে। দড়ির ল্যাডার ফেলে দিয়ে বললাম, 'কোনও চিন্তা নেই। ল্যাডার ধরে ওপরে উঠে এসো।'

দেখলাম লোকটার শরীরের জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে। তাঁবুতে 'ফাস্ট-এডের' ওষুধপত্র সবই আছে। একজন ডাক্তার আছে সঙ্গে। তাকে ধরে ধরে তাঁবুতে নিয়ে যেতে বললাম।

এদিকে ষাট-সত্তোর জন পিগ্‌মি তখন তীর-ধনুক নিয়ে আমাদের ঘিরে ধরেছে। ছোট ছোট বেঁটে খাটো কালো কালো মানুষ। ছোট ছোট ধনুক, ছোট ছোট তীর। তীরের মুখে বিষ মাখানো থাকে। যার গায়ে তীর বিঁধে যাবে তাকে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না।

ফুচুয়া আমার কানে কানে বললে, 'এরা বড় সাংঘাতিক মানুষ। এদের হাত থেকে বাঁচবে কেমন করে?'

ফুচুয়াকে এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলাম। বললাম, 'এই দেশে জন্মেছ, অথচ ওদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ভাষা—কিছু জানো না?'

ফুচুয়া বললে, 'না। সত্যি বলছি জানি না।'

বললাম, 'তাহলে চুপ করে ছাখো—আমি কি করি।'

ঝুঁকোবাবুর কথার মাঝখানে কণা বলে বসলো, 'পিগ্‌মি কাকে বলে?'

ঝুঁকোবাবুর বললে, 'আরে মুখ্যু, তোরাও জানিস না? বইএ পড়িসনি?'

বাচ্চু বললে, 'না তো!'

'লিলিপুট্ কাদের বলে জানিস? লিলিপুটের গল্প পড়িসনি?'

মুকুল বললে, 'আমি পড়েছি। বুড়ো আঙুলের মত ছোট ছোট মানুষ।'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'এদের দেখেই লিলিপুটের গল্প লেখা হয়েছে। এরা ফুট তিনেক লম্বা হয়। আফ্রিকার জঙ্গলের ভেতর ছোট ছোট গ্রামে এরা থাকে। এরা ছিল সাত হাজার পাঁচ শ' আশি জন। ধীরে ধীরে এদের বংশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এখন ছেলেতে মেয়েতে আছে মাত্র ছ' শ' সত্তোর জন। কিছুদিন পরে এরাও থাকবে না। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ থেকে নরখাদক জারোয়া বংশ যেমন লোপ পেয়ে গেল এরাও তেমনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।'

বাচ্চু বললে, 'পিগ্‌মিগুলো তারপর কি করলে?'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'ওরা ভেবেছিল আমরা ওদের শত্রু। আমি ওদের সর্দারকে ডাকলাম। আমাকে ওদের ভাষায় কথা বলতে দেখে ভারী খুশী। বললে, 'তোমাদের আসতে হবে আমাদের বাড়ীতে।' এইবার পড়লাম বিপদে। ওদের বাড়ি যাওয়া মানে ওদের খাবার খেতে হবে। যদি না খাই তাহলে আর বন্ধুত্ব হবে না। বাধ্য হয়ে যেতে হলো। ফুচুন্বাকে সঙ্গে নিলাম।

পাহাড়টার ওপারে ওদের গ্রাম। কিন্তু পাহাড়ে উঠতে হলো না। সরু একটা পথের ওপর দিয়ে আমাদের নিয়ে গেল। মিনিট-পাঁচেক লাগলো না। কয়েকটা বাড়ির মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় দেখলাম পিগ্‌মিদের মজলিস বসেছে। খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান চলছে। সর্দার আমাদের বসতে বললে একটা চাটাইএর ওপর। তারপর দুটি বাঁশের চোঙ্গায় মদ দিলে খেতে। মদটুকু আমি ঢুক করে খেয়ে ফেললাম। ফুচুম্বা কিন্তু খায় না কিছুতেই। আমার কানে কানে চুপিচুপি বললে, 'বিশ্রী গন্ধ।' বললাম, 'তাহলেও খেতে হবে। নইলে ওরা খুব চটে যাবে।' আঙুল দিয়ে নাকটা চেপে ধরে কোনো রকমে খেলে বটে, কিন্তু তক্ষুনি সেখান থেকে উঠে গেল—বোধকরি বমি করবার জন্যে।

ফুচুম্বার ব্যাপার দেখে পিগ্‌মিরা হো হো করে হেসে উঠলো।

তারপরে যে ঘটনা ঘটলো সেইটেই সবচেয়ে বিপজ্জনক। মস্ত বড় একটা গোদা সাপের চামড়াটা ছাড়িয়ে দিয়ে সেইটেকে আগুনে পুড়িয়ে তার মাংসটা

খুবলে খুবলে খাচ্ছিল পিগ্‌মিরা। তারই খানিকটা পোড়া মাংস ওরা আমাকে খেতে দিলে।

খেতেই হবে।

খেলাম।'

বাচ্চু বলে উঠলো, 'সাপের মাংস খেলে?'

ঝুঁকোবাবু বললে, 'খেলাম। যেমন করে মদটা খেয়েছি, তেমনি করে ওটাও খেলাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল, উঠোনে আগুন জ্বলছিল, সেই আলো-আঁধারে ওরা বুঝতে পারলে না যে আমি না খেয়েই মুখ নাড়ছি। ওরা খুশী হলো।

বমি করে ফুচুম্বা ফিরে আসতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। সর্দারের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁবুতে ফিরছি, এমন সময় দেখলাম কয়েকজন পিগ্‌মি একটা শিম্পাঞ্জির বাচ্চাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। ওটাকে ওরা পুড়িয়ে খাবে।'

ফুচুম্বা বললে, 'তাড়াতাড়ি চলুন, নইলে ওই শিম্পাঞ্জির মাংস ওরা আমাদের না খাইয়ে ছাড়বে না।'

সে রাত্রিটা নিরাপদে কেটে গেল।

পরের দিন আমরা যেখানে গিয়ে পৌছোলাম, দেখলাম—যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কলার গাছ। কাঁচা পাকা কলার কাঁদি ঝুলছে প্রায় প্রতিটি গাছে, আর অসংখ্য বাঁদর আর শিম্পাঞ্জি ছুটে বেড়াচ্ছে সেই কলার বাগানে।

পাকা একটা কলা হাতে নিয়ে শিম্পাঞ্জির একটি বাচ্চা এমন নাচ নাচছে যে না দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার নাচ দেখছি, ফুচুম্বা বললে, 'ও আর এমন কী দেখবার জিনিষ? আসুন।'

কি জানি কেন, আমি বাচ্চা শিম্পাঞ্জিটার দিকে হাত বাড়ালাম। হাত বাড়াতেই ছোট ছেলেরা যেমন করে কোলে ওঠে শিম্পাঞ্জিটা ঠিক তেমনি করে আমার কাঁধে চড়ে বসলো।

তারপর সে আর কিছুতেই আমার কাঁধ থেকে নামলো না। তাকে নিয়ে এলাম আমার সঙ্গে।

কলকাতা পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে এসেছিল। আমি যা খেতাম তাই খেতো। আমার বিছানায় শুয়ে থাকতো।

তবে দোষের মধ্যে একটা দোষ তার ছিল। যখন তখন আমার কাঁধে উঠে আমার গোঁফ ধরে টানাটানি করতো।

বলতাম, 'ছাড়্ ছাড়্ বড্ডো লাগছে।'

কিছুতেই শুনতো না।

একদিন এমন টান টানলে যে কয়েক গাছা গোঁফ উঠে এলো তার হাতে। অসম্ভব যন্ত্রণা হতে লাগলো।

সেইদিনই আমার অমন সুন্দর গোঁফ দিলাম কামিয়ে।'

গল্প শুনে ঝুঁকোবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়েই কণা বললে, 'ঝুঁকোবাবুর পাইপে কি আছে জানিস?'

বাচ্চু বললে, 'কি আছে?'

কণা বললে, 'গাঁজা।'

কিষণলাল

ডাক-নাম নীলু-ওস্তাদ।

কিন্তু ভাল নাম তার—অনিল চ্যাটার্জি।

বলে, "বামুনের ছেলে হলে কি হবে। দশ বছর বয়েসে বাড়ি ছেড়েছি। তার পর থেকেই জীবনটা কাটালো পথে পথে।"

তা পথে কাটালে কি এইরকম চেহারা হয় নাকি?

দিব্যি গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, বুকের ছাতিটা ইয়া চওড়া, হাতের কব্‌জিটা শক্ত যেন লোহা।

সার্কাসের খেলা দেখায় নীলু-ওস্তাদ।

ট্রাপিজের খেলা দেখায়, সাইকেলের খেলা দেখায়, রিংএর খেলা, বলের খেলা, আগুনের খেলা—কতরকমের কত খেলা যে নীলু জানে তার আর ইয়ত্তা নেই।

এক-একদিন এক গালে চুন আর এক গালে কালি মেখে 'জোকার' সাজে নীলু। সেদিন হাততালি আর হাসির হুল্লোড় চলতে থাকে সার্কাসের তাঁবুর ভেতর।

নীলু বলে, "জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে থেকে থেকে আমরাও জন্তু-জানোয়ার হয়ে গেছি। তবে মানুষের চেয়ে জন্তু-জানোয়ার অনেক ভালো।"

এইরকম সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে নীলু-ওস্তাদ।

বলে, "একটা ঘোড়া যেদিন ভাল খেলা দেখিয়ে হাততালি পায়, আর-একটা ঘোড়া সেদিন তার ওপর হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরে না। অথচ জানোয়ারগুলোকেই আমরা বলি হিংসুটে।"

কেউ যদি তার প্রতিবাদ করে তো নীলু বলে, "কি জানি ভাই, আমি লেখাপড়া জানি না, চোখে যা দেখেছি তাই বলছি।"

"তবে কি তুমি বলতে চাও, মানুষগুলো জানোয়ারের চেয়েও খারাপ?"

নীলু বলে, "হ্যাঁ, খারাপ বইকি! খারাপ বলেই তো মানুষের এত দুঃখ?"

"ভাল মানুষ কি একেবারেই নেই?"

"আছে। খুব কম। আর কম বলেই তো সাধু-মহারাজরা হরদম বলছে, তোমরা ভালো হও নইলে কষ্ট পাবে। আর বলছে কি আজ থেকে। কিন্তু কেউ শুনছে তাদের কথা?"

এই বলে নীলু তার মুখখানা দেখিয়ে বলে, "কি দেখছো আমার মুখে?"

"বসন্তের দাগ।"

নীলুর গায়ের রং ফরসা, মুখখানা সুন্দর, কিন্তু সারা মুখে বসন্ত রোগের গর্ত-গর্ত চিহ্ন।

নীলু বলে, "এই বসন্তের দাগগুলো যখন দেখি, তখন শুধু একটি মানুষের কথা আমার মনে পড়ে। ভাবি সেইরকম মানুষ যদি সবাই হতো? তাহলে বোধহয় স্বর্গ নেমে আসতো পৃথিবীতে।"

কিন্তু তা বুঝি হবার নয়। স্বর্গ চিরদিনই থাকবে আমার হাতের বাইরে।

নীলু-ওস্তাদ বলেছিল, "আমার বয়স তখন তেরো চোদ্দ। ঢুকে পড়েছি একটা সার্কাস-পার্টিতে। জিনিসপত্র টানাটানি করি। বাঘের খাঁচা ঠেলি। ধরতে গেলে কাজটা চাকরের কাজ। ছোট সার্কাস। একটি হাড়-জিরজিরে বাঘ, চারটি ঘোড়া, একটি হাতি, একটি বাঁদর, আর দুইটি টিয়াপাখি। বড় শহরে পাত্তা পায় না। বীরভূম জেলার একটি আধা-শহরের ডাঙ্গায় তাঁবু পড়েছে। চারদিন খেলা দেখানো হবে।

কোথায় কোন্ পুকুরে চান করেছিলাম। তার পর থেকেই আমার জ্বর। গায়ে হাতে পায়ে অসহ্য বেদনা। জ্বর আর ছাড়ে না কিছুতেই। শহরে বসন্ত হচ্ছিল। কে যেন বললে, ছোঁড়াটার বসন্ত হবে।

তার পরের কথা কিছুই আমি জানি না। জ্বরের ঘোরে বোধহয় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান যখন হলো, দেখলাম একটা গাছের তলায় শুয়ে আছি। সর্বাঙ্গে বসন্তের গুটি বেরিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণা। বাঁশের খুঁটি পুঁতে তালের বড় বড় পাতা দিয়ে ছোট একটি কুঁড়ে তৈরি করা

হয়েছে। কে তৈরি করেছে, কোথায় আছি—তখনও কিছুই ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। খানিক পরে দেখি—একবোঝা নিমের পাতা নিয়ে কিষণলাল এসে বসলো আমার পাশে।

বুঝলাম এসব কিষণলালই করেছে। সার্কাসের ঝাড়ুদার কিষণলাল! বিহারের কোথায় কোন্ এক গ্রামে তার বাড়ি। বাড়িতে কে আছে না-আছে কিছুই জানি না। ভাল বাংলা বলতে পারে না। লিখতে জানে না, পড়তে জানে না, নিতান্ত সাধারণ একটি মানুষ। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। বেঁটেখাটো শক্ত-শক্ত গড়ন। দেখতে ঠিক বাঁদরের মত। ছোট ছোট চোখ, ছোট ছোট দাঁত, মিটমিট করে তাকায় আর সব কথাতেই হাসে। পৃথিবীতে হাসির যে একটা উল্টো পিঠ আছে—যার নাম কান্না, সেকথা যেন ও জানেই না।

আর কিই বা জানে সে?

বসন্ত যে একটা ছোঁয়াচে রোগ, বসন্ত রুগীর সেবা করলে তারও যে বসন্ত হতে পারে—মনে হলো যেন সে জ্ঞানটুকুও তার নেই।

বললাম, 'তুই আমার এত যে সেবা করছিস, তোরও যদি বসন্ত হয়, কে তোকে দেখবে?'

কিষণলাল তার সেই অভ্যস্ত হাসিটুকু হেসে বলেছিল—'রামচন্দ্রজী।'

শ্রীরামচন্দ্রের ওপর অসম্ভব ভক্তি কিষণলালের।

রোজ সন্ধেবেলা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নিমের ডাল দিয়ে সে আমার গায়ে হাওয়া দিত আর মন্ত্রপড়ার মত বিড়বিড় করেব লতো—'শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম!'

শ্রীরামচন্দ্রের দয়া, না কিষণলালের অক্লান্ত সেবা জানি না, আমি সেরে উঠলাম।

আমার পকেটে ছিল আমার মাইনে থেকে জমানো বারোটি টাকা। জামাটা খুঁজতে গিয়ে দেখি, বারোটি টাকা যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। বুঝলাম, আমার অসুখের যাবতীয় খরচ কিষণলালই চালিয়েছে।

বললাম, 'চল্ এবার দেখি কোথায় আমাদের তাঁবু পড়েছে।'

কিষণলাল হেসে বলেছিল, 'দেখবি কি জন্যে? নোক্‌রি তো ছুটু গেইল্।'

এই বলে যেকথা সে বলেছিল, সে বড় দুঃখের কথা।

বলেছিল, 'সার্কাস-কোম্পানির মালিক মানুষ নয় নীলু। নইলে জ্বরে

বেহুঁশ হয়ে যে পড়ে আছে সেইরকম একটা ছেলেকে শীতকালের রাত্রে একটা গাছের তলায় ফেলে দিয়ে তারা যায় কেমন করে?'

প্রতিবাদ করেছিল ঝাড়ুদার কিষণলাল। প্রতিবাদ করেছিল, মালিকের মুখের ওপর। হাতে-পায়ে ধরেছিল। কেঁদেছিল। বলেছিল, 'ওকে কোনও শহরে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ফেলে দাও বাবু, এমন করে রাস্তার ধারে ফেলে যেয়ো না। ও মরে যাবে।'

মালিক বলেছিল, 'এতগুলি লোক আমার কোম্পানিতে, এই একটা ছোঁড়ার জন্যে আমরা সবাই তো মরতে পারি না।'

কিষণলাল বলেছিল, 'তাহলে একটা বিছানা দাও।'

'বিছানা কোথায় পাব?'

কিষণলাল বলেছিল, 'কোম্পানির এত এত চট, এত এত কম্বল। একটা কম্বল দাও।'

মালিক দেয়নি। দিয়েছিল একজন সহিস। ঘোড়ার গায়ে চাপা দেওয়া ছেঁড়া একটা চট সে ছুঁড়ে দিয়েছিল কিষণলালের গায়ের ওপর। বলেছিল, 'এইটে নিয়ে যা।'

আর-একজন ঝাড়ুদার দিয়েছিল তার নিজের কম্বলখানা।

মালিক জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুইও কি ওর সঙ্গে থাকবি নাকি?'

কিষণলাল বলেছিল, 'কেউ যখন থাকছে না তখন আমিই থাকি।'

মালিক বলেছিল, 'যেমন বাঁদরের মতন চেহারা, তেমনি বাঁদরের মতন বুদ্ধি! মরবি যে হতভাগা!'

হতভাগা কিষণলাল সেকথার জবাব দেয়নি।

'মরিস তো জ্বালা জঞ্জাল চুকেই যাবে। বাঁচিস যদি তাহলেও আর আসিস না। চাকরি আমি আর দিতে পারব না। অসময়ে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছিস—সেকথা মনে থাকে যেন।'

কিষণলালের মনে ছিল। এরকম মনিবকে ভুলে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়। কাজেই সে আর যেতে চায়নি।

তা কষ্ট একটু হয়েছিল বইকি!

সবে রোগ থেকে উঠেছে নীলু। তাকে নিয়েই যা কষ্ট। নইলে কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলে না কিষণলাল।

পথে পথে কেটেছিল আরও দশটা দিন।

'পয়সা-কড়ি তখন তাদের একদম ফুরিয়ে গেছে।' যাহোক একটা চাকরি না হলে আর চলে না।

তখন তারা যে-শহরটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে-শহরটার নাম আসানসোল। শুনলে, সেখানে নাকি একটা খুব বড় সার্কাস-পার্টি খেলা দেখাচ্ছে।

দু'জনেই গিয়ে হাজির হলো সেইখানে।

চাকরি তারা দু'জনেই পেয়ে গেল, কপালগুণে।

সেই কোম্পানিতেই রয়েছে তারা আজ বাইশ বছর।

নীলু বলে, "জীবনে তার যা কিছু উন্নতি সব ওই কিষণলালের জন্যে।"

সে-ই প্রথমে শিখিয়েছিল তাকে, শরীরটাকে কেমন করে মজবুত করতে হয়। তারপর সাগরেদি করিয়েছিল সার্কাসের খেলোয়াড়দের কাছে।

কিষণলাল এখনও রয়েছে সেই সার্কাস-পার্টিতে। এখন সে অবশ্য বুড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু দেখলে তাকে বুড়ো বলে মনে হয় না। চুল পেকেছে কিন্তু দাঁত একটিও ভাঙেনি।

নীলু হয়েছে নীলু-ওস্তাদ।

সার্কাসে একটা মেয়ে কাজ করে। গোয়ানী মেয়ে। যেমন তার স্বাস্থ্য, তেমনি তার খেলা। কাজেই সার্কাস-পার্টিতে তার খাতির খুব বেশী।

মেয়েটির নাম আগ্‌নী। তারের রিংএ আগুন লাগিয়ে বাঘ নিয়ে, সিংহ নিয়ে সে এক অদ্ভুত রকমের খেলা দেখায়। তাই সেই আগুন থেকেই বোধকরি তার নাম হয়েছে আগ্‌নী।

এই আগ্‌নী মেয়েটা কিষণলালকে বলে, 'বাপ্পা।'

বাপ্পা বলে ডাকে, অথচ দিনরাত তাকে যা-তা বলে, আর খিলখিল করে হাসে।

তার হাসি শুনে চারিদিক থেকে লোক জড়ো হয়ে যায়। তারাও হাসে।

আগ্‌নী বলে, "বাপ্পা. শোনো!"

কিষণলাল তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, "জয় রাম-জী!"

বাস্, তাই না শুনেই আগ্‌নী খিলখিল করে হাসতে থাকে।

তার হাসি দেখে যারা তার কাছে এসে দাঁড়ায়, আগ্‌নী হাসতে হাসতে কিষণলালকে দেখিয়ে তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, "বাপ্পা আমাকে 'রাম-জী' বলছে।"

এতে হাসির কি থাকতে পারে তারা বুঝতে পারে না। কেউ বা সরে যায়, কেউ বা আগ্‌নীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু শুধুই হাসে।

আগ্‌নী তাদের হাসাবার জন্যেই বোধ হয় কিষণলালকে বলে, "বাপ্পা, আগলে জনমমে তু বান্দর ছিলি।"

কিষণলালের মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ছোট ছোট চোখদুটি চিক-চিক করে। ঘাড় নেড়ে বলে, "হাঁ মাঈ।"

বলেই সে হাতদুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, "জয় হনুমানজী!"

আগ্‌নীর হাসি যেন আর থামে না কিছুতেই।

এমনি চলতে থাকে রোজই। আগ্‌নীর চোখে কিষণলাল একটা অসভ্য অশিক্ষিত বর্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। 'বাপ্পা' বলে ডাকে, কিন্তু তাকে নিয়ে হাসি-রহস্য করতেই সে ভালবাসে। বাঁদর বলে, ওরাং-ওটাং বলে, আর বলে, "তোমার জন্যে আমি একটা খাঁচা তৈরি করিয়ে দেবো বাপ্পা।"

কিষণলাল একটুখানি হেসে বলে, "তাই দিও মাঈ।"

"তুমি তার ভেতর থাকবে তো?"

কিষণলাল বলে, "থাকবো।"

নীলু-ওস্তাদ রেগে রেগে মরে।

এক-একদিন তাকে সে সেখান থেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, "তোকে নিয়ে আগ্‌নী হাসি-রহস্য করে তুই কি তা বুঝতেও পারিস না?"

কিষণলাল বলে, "করুক না!"

"শরীরে কি তোর রাগ নেই? তুই কী রে?"

কিষণলাল মিটমিট করে তাকায় আর হাসে। কোনও জবাব দেয় না।

আবার আর-একদিন।

আগ্‌নীর হাসি শুনে নীলু-ওস্তাদ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখে, কিষণলালকে নিয়ে আবার সে হাসি-রহস্য আরম্ভ করেছে।

কিষণলালের অপরাধ—সার্কাসের বড় হাতিটাকে সে হাত-জোড় করে প্রণাম করে বলেছিল, "জয় রামজী!"

নীলু সেদিন আর কিষণলালের কাছে না গিয়ে এগিয়ে গেল আগ্‌নার দিকে। বললে, "কেন তুমি ওঁর সঙ্গে রোজ রোজ ওরকম কর? কিষণলাল কি পাগল নাকি?"

আগ্‌নী বলে, "হ্যাঁ, পাগলই তো!"

"হোক্ পাগল। তবু তুমি ওকে নিয়ে হাসাহাসি করতে পাবে না।"

আগ্‌নীকে এরকম শাসিয়ে কেউ কথা বলবে—আগ্‌নী তা চায় না। তক্ষুণি সে নীলু-ওস্তাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলে উঠলো, "বেশ করবো আমি হাসাহাসি করব, আমার যা খুশি তাই করব; তোমার কি?"

নীলু বললে, "আমি বারণ করছি।"

আগ্‌নী বললে, "তুমি আমার শাসনকর্তা নাকি? তোমার বারণ শুনছে কে?"

"শুনবে না?"

"না, শুনবো না।"

নীলু বললে, "কথাটা মনে থাকে যেন।"

আগ্‌নী বললে, "খুব মনে থাকবে। তুমি যা করতে পারো কোরো।"

মদন-জোকারের সেদিন অসুখ করেছিল। নীলু জোকার সাজলে। সাদায় কালোয় তার মুখখানা করলে কিম্ভূতকিমাকার। নাকটা করলে একটা ডিমের মত। ঠোঁট দুটো মনে হতে লাগলো যেন কান পর্যন্ত টানা।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সেরকম পোশাক সে অন্যদিন পরে না। কিষণলালকে বললে, "দেখবি আজ কিরকম হাসাবো।"

কিষণলাল দেখতে গেল।

তা সত্যিই, নীলু-ওস্তাদের ক্ষমতা আছে।

তার অঙ্গভঙ্গী আর মুখের কথা শুনে ছেলেমেয়েরা তো হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

যেই একটা খেলা দেখানো শেষ হয়, নীলু অমনি এগিয়ে আসে। বলে, "আমি ওই খেলা দেখাবো।"

অন্য একজন জোকার বলে, "পারবি না নীলু, পালিয়ে আয়।"

চট্ করে তার গালে একটা চড় মেরে বসে নীলু। সে চড়ের প্রচণ্ড শব্দে মনে হয় বুঝি তার গালটা ফেটে গেল। কিন্তু ফাটেও না কিছু না—লোকটা মিছেমিছি কাঁদতে বসে।

নীলু এগিয়ে যায় খেলা দেখাতে।

খেলা দেখাতে গিয়ে আনাড়ীর মত যেরকম ভাবে সে উলটেপালটে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নেয়—তাই না দেখে তো লোকজন হেসে একেবারে গড়াগড়ি।

ঘন ঘন ওই অত লোকের হাসির যেন ঝড় বয়ে যায় সেই বিরাট তাঁবুর মধ্যে!

হাসির পরেই হাততালি।

নীলুর বাহাদুরি দেখে সবাই হাততালি দেয় অবাক্ হয়ে গিয়ে। নীলু যে একজন পাকা ওস্তাদ তাতে কোনও সন্দেহই নেই। নইলে পড়তে পড়তে নিজেকে ওরকমভাবে সামলে নেওয়া—সে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

এবার আগ্নীর খেলা।

আগ্নীও কম বাহাদুর নয়। ছোট ছোট বলের খেলা দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দিলে সবাইকার। ছোট ছোট বল হাত দিয়ে কী কৌশলে যে ছোড়ে, সে বল সোজা না গিয়ে গোল হয়ে চক্রের মত তার চোখের সামনে পাইপাই করে ঘুরতে থাকে। একটি দুটি নয়, ছ'টি বল একসঙ্গে। তারপর কোনও বল সে ধরে নেয় মুখ দিয়ে, কোনোটি ডান হাত দিয়ে কোনোটি বাঁ হাত দিয়ে। চট্ চট্ করে ধরে, আর ছোঁড়ে। তার ছোঁড়ারও বিরাম নেই, ধরারও বিরাম নেই, ঘোরারও বিরাম নেই!

নীলুও বলের খেলা দেখাবে।

সে আবার আর-এক আশ্চর্য ব্যাপার। তারও চারটি বল ঘুরতে লাগলো সামনাসামনি। নীলুর কপালে আর নাকের ডগায় প্রতিটি বল ঠুকে ঠুকে যায়, আর নীলু যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

নীলু যত চেঁচায়, লোকে তত হাসে।

তারপর এলো আর-একটা খেলা। সার্কাসের সব চেয়ে সেরা খেলা। জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের খেলা।

সিংহের পিঁজরেটা টেনে আনলে চারজন লোক।

রুপোলী এক চমৎকার পোশাক পরে পর্দা সরিয়ে ছুটে এসে দাঁড়ালো আগ্নী! রুপোর চুমকি ঝকমক করছে তার সারা গায়ে। আটসাঁট পোশাকে তাকে মানিয়েছে সুন্দর। মাথায় রুপোলী মুকুট। হাতে একটি লোহার রড্। মাথা ঝুঁকিয়ে সবাইকে কুর্নিশ করলে আগ্নী।

সিংহের ওপর চড়ে সে আজ সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী হবে।

খুলে দেওয়া হলো সিংহের খাঁচা।

চোখের ইশারায় নীলুকে সেখান থেকে সরে যেতে বললে আগ্নী। নীলু কিন্তু সরলো না। খাঁচায় একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

আগ্নীর তখন কোনও দিকে নজর দেবার অবসর নেই। ছাড়া সিংহ তখন তার চোখের সামনে। হাজার হাজার দর্শক খেলা দেখবার জন্য হাঁ করে তাকিয়ে আছে সেইদিকে।

সিংহের ঘাড়ে একটা হাত দিয়ে আগ্নী চড়ে বসলো তার পিঠের ওপর। হাতে ত্রিশূলের মত লোহার রড্। মাথায় ঝলমল করছে রূপোলী মুকুট। চমৎকার দেখাচ্ছে আগ্নীকে। মুখে তার মৃদু মৃদু হাসি!

বিস্মিত বিমুগ্ধ দর্শকের হাততালি পড়ছে চারিদিক থেকে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে নীলু-ওস্তাদ।

কী বিস্ময়কর খেলা সে দেখাবে তার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো দর্শকের দল।

নীলু চট্ করে এসে দাঁড়ালো সিংহের সুমুখে।

এসেই তার সেই কিম্ভূতকিমাকার পোশাকের ঢিলে হাতদুটো তুলে এমন একটা ভঙ্গী করলে যে, সিংহটা তক্ষুনি এক ঝটকা মেরে পিঠ থেকে ফেলে দিলে আগ্নীকে। আগ্নী পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়িয়ে ঠাস্ করে মারলে নীলুর গালে এক চড়।

নীলুও চুপ করে রইলো না। তক্ষুণি সে আগ্নীর দুটি গালে এমন জোরে দুটি চড় মারলে যে তার পেন্টকরা সাদা গাল লাল হয়ে উঠলো। মাথার মুকুট পড়লো খসে, খাটো খাটো মাথার চুল পড়লো পিঠের ওপর এলিয়ে।

দর্শকেরা ভেবেছিল বুঝি এটাও একটা খেলা। হাততালি দেবার জন্যে তারা তখন তাদের হাতগুলো সবে তুলেছে। কিন্তু চোখের নিমেষে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যে তাদের হাততালি দেওয়া আর হলো না।

নীলুর হাতের প্রচণ্ড চড় খেয়ে আগ্নী তখন গালে হাত দিয়ে রাগে ফুলছে। কেমন করে এর প্রতিশোধ নেবে ভাবছে হয়ত। ওদিকে সিংহ আছে খোলা। সেও তখন রুখে দাঁড়িয়েছে নীলুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে।

এমন সময় কোত্থেকে ছুটে এসে দাঁড়ালো ঝাড়ুদার কিষণলাল—কেউ কিছু বুঝতে পারলে না।

সিংহটা ঝাঁপিয়ে পড়লো তারই ওপর। কিষণলালের বাঁ হাতের ওপর থাবা চালিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে আর-একটু হলেই দিয়েছিল তাকে শেষ করে। কিন্তু বলিহারি নীলু-ওস্তাদের বাহাদুরি। ইলেকট্রিক রড্‌টা আগ্‌নীর হাত থেকে টেনে নিয়ে কী কৌশলে যে সেই পশুরাজ সিংহের মুখটাকে খাঁচার দিকে ফিরিয়ে তাকে নিরস্ত করলে সে-ই জানে। লোকজন তখন এসে পড়েছে। দর্শকদের কোলাহল শুরু হয়েছে চারিদিকে। ছেলেমেয়েরা কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

সিংহের খাঁচা বন্ধ করিয়ে 'মাইক্' হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন সার্কাসের ম্যানেজার।

"ভয় পাবেন না। আপনারা স্থির হয়ে বসুন। জানোয়ারে মানুষে এরকম বিভ্রাট এক-আধটু হয়েই থাকে।"

কিষণলালকে দু'হাত দিয়ে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে নীলু তখন ছুটেছে তার নিজের ছোট্ট তাঁবুর ভেতর। শুইয়ে দিয়েছে তার নিজের বিছানায়। ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে তার হাত দিয়ে।

—"এ কী করলি, বল্ তো তুই? পরের জন্যে তুই কি তোর জীবনটা দিয়ে দিবি?"

কিষণলাল বললে, "এই তো মানুষের ধরম্ নীলু।"

নীলু বললে, "এখন কি হবে বল্ দেখি? বুড়ো বয়েসে এই হাতটা যদি জখম হয়ে যায়—"

"কিছু হবে না। সব ভাল হয়ে যাবে।"

বাইরে আগ্‌নীর গলার আওয়াজ শোনা গেল।

"বাপ্পা! বাপ্পা!" তেমনি রাজেন্দ্রাণীর বেশে ছুটতে ছুটতে নীলুর তাঁবুতে ঢুকে সে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়লো ঝাড়ুদার কিষণলালের পায়ের কাছে। কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমি আর কখনও তোকে কিছু বলবো না বাপ্পা। তুই আমাকে ক্ষমা কর্!"

কিষণলাল ম্লান একটুখানি হেসে বললে, "জয় রামচন্দ্রজী!"

বাঁ হাতটা সে তুলতে পারছিল না। ডান হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বোধকরি সে শ্রীরামচন্দ্রকে একটি প্রণাম করলে।

সাঁওতাল পল্লী

ছোট-ছোট পাহাড়, আর শাল-মহুয়ার বন। সোজা চলে গেছে উত্তরদিকে। জানি না কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

শাল-মহুয়ার বনের মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট সাঁওতালের বস্তি।

এম্‌নি এক সাঁওতালের বস্তিতে একদিন দেখা গেল, মাদল বাজছে, বাঁশী বাজছে, কিসের যেন উৎসবে মেতেছে তারা। নীল নির্মল আকাশে উঠেছে—পূর্ণিমার চাঁদ। আর সেই চাঁদের আলোয় সারা বন একেবারে আলোয় আলোময়।

বোধহয় ছিল—বসন্তকাল। ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। মিষ্টি-মিষ্টি হাওয়া বইছে এলোমেলো। মহুয়া ফুলের উগ্র গন্ধে-ভরা বসন্তের হাওয়া।

কিন্নির বিয়ে হবে কাল।

তাই তাদের এত আনন্দ!

নেচে আর গেয়ে, খেয়ে আর খাইয়ে,—দিলে রাতটা কাটিয়ে।

পরের দিন সকাল হলো।

সাঁওতাল-পল্লীর স্নিগ্ধ সুন্দর সকাল। পূর্ব-দিক্‌চক্রবাল রাঙা হয়ে উঠেছে। সেই রাঙা আলো এসে পড়েছে, চিকন-কচি গাছের পাতায়। এসে পড়েছে তাদের শ্রেণীবদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন কুটিরের আঙিনায়।

মোরগ ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে জেগে উঠেছে সাঁওতাল-পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা। আবার সুরু হলো তাদের আনন্দ-উৎসব।

ছোট একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁসে, ছোট একটি শুকনো-নদীর ওপার থেকে আসবে—কিন্নির বর। ক্রোশ-খানেক দূরে তাদের পাহাড়তলি গ্রাম।

বরের নাম—সুখন্।

সুখনের মা আর কিন্নির মা—বাল্যকালের বান্ধবী তারা। তাই তাদের অনেকদিনের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে চলেছে আজ সন্ধ্যায়।

কিন্নি—সুখনের বাক্‌দত্তা।

সূর্যাস্তের সময় শিঙা বাজলো।

তার সেই প্রচণ্ড আওয়াজে, বনানীপ্রান্ত যেন কেঁপে উঠলো।

সবাই বুঝলো—বর আসছে।

ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা ছুটলো বর দেখতে।

এদিকে কন্যাপক্ষ প্রস্তুত হলো, তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য। যুবকেরা নিলে, মাদল আর বাঁশী। যুবতীরা দাঁড়ালো সারি বেঁধে, হাতে হাত দিয়ে। নেচে-নেচে আর গান গেয়ে তাদের অভ্যর্থনা করতে হবে। এই তাদের প্রচলিত রীতি।

গান সুরু হলো :

—"দে পেড়া দেলা পেড়াদে হুড়ুপ্ পে
গাণ্ডো মাচি পেড়া মেনাঃ তা লেয়া
তাং আপেয়ালে পেড়া ঝাডি লোটাতে
ওয়ান্ পে পেড়া বেয়াড় কাণ্ডা দাঃ !"

অর্থাৎ, হে কুটুম্ব! তোমরা এসে বোসো! আমাদের পিঁড়ি আছে, মাচিয়া আছে। হে কুটুম্ব! আমরা তোমাদের জল খেতে দেবো। ঠাণ্ডা কলসীর ঠাণ্ডা জল খেয়ে তোমরা ঠাণ্ডা হও আগে।

ওদিকে বর আর বরযাত্রী, জবাব দিলে। হলুদরঙের কাপড়-পরা বরের মাথায়, লালরঙের গাম্‌ছা-বাঁধা। কৃষ্ণ-কুঞ্চিত বাব্‌রি-চুলে গোঁজা, কচি শালের পাতা, আর গলায় দুলছে, লাল কাঁটির মালা। নিটোল সুন্দর দেহ, আর চওড়া বুকের ছাতি!

তাকে মাঝখানে রেখে, নেচে-নেচে এগিয়ে এলো বরযাত্রীর দল।

বাজলো মাদল আর বাজলো বাঁশী। গান ধরেছে :

"সাঙ্গিং দিসম্ পর্চা, সঙ্গে বরিয়াৎ
বহড় দারে রেপে—ডেরা ফেতলে
দাকা হুতুদ্ তিমিন্ রেচাং
হুকা তামাকুল্ এমা লেপে।"

অর্থাৎ, আমরা ভিন্‌গাঁয়ের বরযাত্রী। তোমরা আমাদের বাসাবাড়ী দিলে, গাছের তলায়। খাবার দিতে দেরি হতে পারে, এখন আমাদের হুঁকো দাও, তামাক দাও, কল্‌কে দাও!

এমনি ক'রে এরাও গায়, ওরাও গায়। এরাও নাচে, ওরাও নাচে।

দেখতে-দেখতে দিনের আলো নিবে গেল। আকাশে উঠলো চাঁদ। আর সেই চাঁদের আলোয় চাঁদবরণী কিন্নিকে নিয়ে, এগিয়ে এলো তার সখীর দল।

—"গাতে গাতে লাং তাহে কানা
অডি গাতে লাং তাহে কানা।"

—"অনেকদিন আমরা একজায়গায় আছি। তোমাকে ভালোবাসি আমরা, আমাদের প্রাণের চেয়েও বেশী।"

লজ্জাবনতমুখী কিন্নির পরনে হলুদ-রাঙা শাড়ী, বাঁকা সিঁথি, এলো চুল, গলায় দুলছে, ফুলের মালা। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী কন্যা, পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে—বরের দিকে।

সখীরা গাইতে-গাইতে থম্‌কে থামলো। একজন সখী এগিয়ে এলো, কিন্নির কাছে। অবনত মুখখানি তার তুলে ধরতেই সে হেসে ফেললে। কালো মেঘের ওপর খেলে গেল যেন বিদ্যুতের রেখা।

সখী গাইলে :

—"মেৎ এঁপেল্ হ আরসি মেনাঃ
আলাং এঁপেল্ হ বান্ন আ।"

—"আমাদের মুখ দেখবার আরশি আছে—কালো পাথরের ওপর নিস্তরঙ্গ ঝরণার জল; কিন্তু সখী, তোমার এই মুখখানি দেখবার আশা আর নেই।"

এম্‌নি করে ক্রমশঃ এগিয়ে-এগিয়ে দু'দলে যখন এক হয়ে গেছে, এমন সময়, টগ্‌বগ ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে এলো একজন ঘোড়সোয়ার।

ঘোড়া থেকে নেমেই সে বললে : থামো! বন্ধ করো তোমাদের গান-বাজনা!

সবাই তার দিকে ফিরে তাকালে।

কিন্নি বলে উঠলো : দাদা!

হ্যাঁ, কিন্নির দাদাই তো!

কিম্রির দাদা—মুংরা।

বলিষ্ঠ জোয়ান্ ছোক্‌রা, গায়ে খাঁকি রং-এর হাতকাটা জামা, পরনে হাফ্‌প্যান্ট, পায়ে জুতো, মাথায় কিন্তু টুপি নেই, বাব্‌রি-চুল—লাল চওড়া একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা। দেখলে, সাঁওতাল ব'লে চেনবার উপায় নেই। কি করে, কোথায় থাকে, সঠিক খবর কেউ বলতে পারে না। কেউ-কেউ বলে, চুরি, ডাকাতি আর রাহাজানি করবার একটা দল আছে তার। চার-পাঁচ মাস পরে এক-আধবার আসে এখানে, দু'একদিন থাকে, তারপর হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়।

মুংরা যখনই আসে, জলের মত' টাকা-পয়সা খরচ করে। কাজেই তার আসাটা এখানে অপছন্দ করে না কেউ।

তারই সমবয়সী—যারা এতক্ষণ কিম্রির বিবাহ-উৎসবে মেতে উঠেছিল, সবাই তারা খুশী হয়ে তার কাছে এগিয়ে এলো।

একজন বললে: তাই তো বলি, বোনের বিয়ে, মুংরা না এলে চলে! কই, তোর সেই সাদা চুরুট দে!

সাদা চুরুট মানে, সিগারেট।

মুংরা এতক্ষণ তার ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বাঁধা একগোছা তীর আর ধনুকটা খুলছিল। একজন বললে: বেশ তো আছে, ওগুলো খুলছিস্ কেন?

আর-একজন বললে: বা-রে, ওগুলো সবই তো—বিষ-কাঁড়। কেউ যদি একবার ওতে হাত দেয় তো, বাস্, তাকে আর কথাটি বলতে হবে না। ওই দিয়ে মুংরা কত বাঘ মেরেছে, না' রে?

মুংরা কথার জবাব না দিয়ে, জামার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই-এর বাক্সটা বের করে তার গায়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে, তারপর ধনুক আর তীরগুলো নিয়ে এগিয়ে গেল তাদের ঘরের দিকে।

তার মা তখন প্রতিবেশিনী একজন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। মুংরা তার হাতের তীরগুলো ঘরের একপাশে নামিয়ে, ধনুকটা হাত গলিয়ে বের করতে-করতে ডাকলে: মা!

যতই অপরাধ করুক্, পেটের সন্তান মুংরাকে দেখে মার মুখখানা যেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আনন্দে, আবার তেমনি অভিমানে তার চোখে এলো জল। কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে: বলি, হাঁরে মুংরা, তোর বাবা

নেই, আমাকে একাই সব করতে হচ্ছে, আর তুই কি-না আজ এলি —বোনের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে! কিম্রির বিয়ের কথা কোথায় শুনলি?

মুংরা গম্ভীরভাবে বললে: যেখানেই শুনি, তোমার জানবার দরকার নেই। বোনের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে আসিনি, আমি এসেছি, বিয়ে—বন্ধ করতে।

মার মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। বললে: বিয়ে বন্ধ করতে? কেন?

মুংরা বললে: বাবা বেঁচে থাকতে আমরা যখন ডুম্‌কায় ছিলাম, তখন কার সঙ্গে কিম্রির বিয়ের কথা দিয়েছিলে?

মা রেগে উঠলো। বললে: যা-যাঃ, আমি কাউকে কথা দিইনি।

মুংরা বললে: বাবা—কথা দেয়নি?

মা বললে: না।

মুংরা বললে: নিশ্চয় দিয়েছিল।

মা বললে: ছ্যাখ মুংরা, আমরা যখন ডুম্‌কায় ছিলাম, তুই ছিলি তখন এই এতটুকু—চার-পাচ বছরের ছেলে, আর কিম্রি ছিল, দু-তিন বছরের। তখনকার কথা তোর মনে আছে?

মুংরা বললে: সেখানকার ভূতু মাঝির ছেলে, গারাংএর সঙ্গে কিম্রির বিয়ের কথা তাহলে উঠলো কেমন করে?

মা বললে: কেমন করে উঠলো, এরপর তোকে বলবো একসময়। এখন এই বিয়েটা চুকে যাক্ বাবা, এই নিয়ে গোলমাল করিস্‌নি।

মুংরা কিছুতেই শুনলে না তার মায়ের কথা। কথা বলতে-বলতে তারা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলতে লাগলো: গোলমাল করবার জন্যেই আমি এসেছি! আমি কিছুতেই এ-বিয়ে হতে দেবো না।

মা বললে: ওরে হতভাগা শয়তান, তুই আমার পেটের ছেলে হয়ে, শত্রুতা করবি? তোর সহোদর বোনের বিয়ে, তোর একটু লজ্জা করছে না?

মুংরা বললে: না।

মা বললে: কার সঙ্গে কিম্রির বিয়ে দিচ্ছি—দেখেছিস্? পাহাড়তলির সুখন্—আমার সইএর ছেলে। সুখনের মাকে তুই সই-মা বলে ডাকতিস্,

সুখন্‌কেও তুই চিনিস্। যা, দেখে আয় কেমন মানিয়েছে। এই বিয়ে তুই ভেঙে দিতে চাস্, হতভাগা! যা—বেরো তুই, দূর হ' এখান থেকে।

মা ও ছেলের এই গোলমাল শুনে, কয়েকজন ছেলে আর মেয়ে ছুটে এসে দাঁড়ালো তাদের কাছে।

বিপদ-আপদ কিছু হয়েছে ভেবে, তাদের পিছু-পিছু এসে দাঁড়ালো, ধুড়ো সর্দার মাঝি। এসেই জিজ্ঞাসা করলে: কি হয়েছে?

মা তার ছেলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে: আমার ওই হতভাগা ছেলেটাকে শুধোও কি হয়েছে। ও এসেছে, বোনের বিয়ে বন্ধ করতে।

সর্দার জিজ্ঞাসা করলে: কেন রে?

মুংরা বললে: আমরা যখন দুম্‌কায় ছিলাম, তখন সেখানকার একজন বেশ বড়লোক সাঁওতাল, ভুতু মাঝি—

সর্দার বললে: ভুতু মাঝি? চিনি।

মুংরা বললে: চেনো তাকে?

সর্দার বললে: খুব চিনি। ব্যাটা—ডাকাত। ডাকাতের দল ছিল তার। একবার কয়েদ হয়েছিল ব্যাটার। তারপরেই সে মরে গেল।

মুংরা বললে: তা সে ডাকাতই হোক্ আর চোরই হোক্—আমাদের কি! আমার বাবা তাকে কথা দিয়েছিল, তার ছেলে—গারাংএর সঙ্গে কিম্নির বিয়ে দেবে।

সর্দার বললে: কথা দিয়েছিল তোর বাবা? তোর মা কি বলে?

বলেই সে মুংরার মায়ের মুখের দিকে তাকালে।

মুংরার মা বললে: তাহ'লে শোনো কি হয়েছিল।—কিম্নি তখন দু-বছর কি তিন বছরের মেয়ে। আর এই মুংরা তখন বছর-পাঁচেকের। সেইসময় মুংরার বাবা ফিরে এলো, আসাম থেকে। একজন আড়-কাঠি তাকে নিয়ে গিয়েছিল, আসামের চা-বাগানে কাজ করবার জন্যে। ফিরে এলো—অসুখ নিয়ে। এমন সর্বনাশা অসুখ—দুম্‌কার ডাক্তার বললে—গায়ে ছুঁচ ফুঁড়তে হবে। মুংরার বাপ কিছুতেই রাজী হলো না। ঘরে এসে শুয়ে পড়লো। সেই-যে শুলো—আর উঠলো না। ঘরে টাকা-পয়সা নেই। এই ভুতু মাঝি থাকতো আমাদের ঘরের কাছেই। চুরি ক'রে না ডাকাতি করে পয়সা করেছিল, ভগবান জানেন! আমরা শুনেছিলাম, তার পয়সা আছে। গিয়ে দাঁড়ালাম হাত পেতে। একবার দিলে, পাঁচ

টাকা; আর-একবার পাঁচ টাকা। এই দশটি টাকা নিয়েছিলাম তার কাছ্ থেকে। কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না, মুংরার বাবাকে। পাঁচ বছরের ছেলে, আর তিন বছরের মেয়ে নিয়ে একা. কি করবো, কেমন ক'রে দিন চালাবো ভাবছি, এমন সময় ওই সুখনের মা আমাকে নিয়ে এলো, পাহাড়তলিতে। আসবার সময় ভূতু মাঝিকে বলতে গেলাম,—তার কাছ থেকে কর্জ-করা দশটি টাকার কথা আমার মনে রইলো। যেমন ক'রে পারি, শোধ করবো। ভূতু মাঝি বললে: শোধ করতে হবে না। তোমার মেয়ে যখন বড় হবে, তখন টাকা-পয়সার অভাবে তার বিয়ে যদি না দিতে পারো তো, আমারি ছেলে গারাংএর সঙ্গে তার বিয়ে দিতে পারো!…এই তো কথা! তারপর ধরো, ওই সুখনের মা—আমার সই, আমাকে নিয়ে এলো তাদের ঘরে। সে যদি আমাকে না দেখতো, তোরা কি এতদিন বাঁচতিস্, না, অমনি বাবু সেজে, ঘোড়া ছুটিয়ে ঘুরে বেড়াতিস্?

মুংরা বললে: সর্দার, মা মিছে কথা বলছে। আমার মনে হয়—দশ টাকা কর্জ শোধ করতে না পেরে, আমার মা হয়তো বলেছিল—তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো, আর নয়তো ভূতু মাঝি বলেছিল—তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিও!

মুংরার মা, রেগে ব'লে উঠলো: আমার এত সুন্দর মেয়ে ক্সিরির বিয়ে দেবো—ওই কয়েদ-খাটা ডাকাতের সঙ্গে! ছেলেটাকে আমি দেখেছি—গিরগিটির মত লম্বা—

মুংরা বললে: তাকে তুমি, এখন তো ছাখোনি, দেখেছো ছেলেবেলায়। এখন সে মস্ত জোয়ান—বিষ-কাঁড় দিয়ে, বাঘ মারে।

মুংরার মা বললে: বুঝেছি, তুই তারই সাকরেদ্।

মুংরা বললে: সর্দার, ও-সব কথা তোমার শোনবার দরকার নেই। তুমি শুধু ভেবে ছাখো—আমরা সাঁওতাল। আমাদের কথার দাম অনেক। কথার জন্য আমরা 'জান্' দিতে পারি।

মুংরার সাজ-পোষাক হাব-ভাব আর দিল-দরিয়া মেজাজ দেখে, এখানকার এই-সব সহজ সরল শান্তিপ্রিয়, অরণ্যচারী সাঁওতালেরা সকলেই তাকে সমীহ সম্মান করে।

সর্দারের মাথাটা কেমন-যেন গোলমাল হয়ে গেল। খানিক ভেবে সে হাত তুলে, গান-বাজনা দিলে থামিয়ে। বললে: থামো। বিয়ে আজ বন্ধ থাকবে।

—সে কি ?

গান-বাজনা বন্ধ হ'লো, বটে, কারণ, সর্দারের আদেশ—অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু এ যে, বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত !

সর্দার তাদের বুঝিয়ে বললে।

বললে: মুংরা ঠিকই বলেছে। আমরা, সাঁওতাল। আমরা যদি কথা দিয়ে কথা না রাখি, আমাদের পাপ হবে। কাজেই, সুখনের সঙ্গে কিন্নির বিয়ে আজ হবে না।

সর্দার বললে: আজ যেমন আকাশে চাঁদ রয়েছে, সেদিনও তেমনি আকাশে চাঁদ থাকবে। অর্থাৎ, আগামী পূর্ণিমার রাত্রে,—কিন্নিকে আজ বিয়ে করবার জন্যে যে এসেছে, সেও থাকবে, ভূতু মাঝির ছেলেও থাকবে। আমি একটা জায়গা দেখিয়ে দেবো, সেইখানে যে তার হাতের তীর লাগাতে পারবে, তারই হবে জিৎ। কিন্নির সঙ্গে সেইদিন তার বিয়ে হবে।

মুংরার মুখে, হাসি দেখা গেল।

কিন্তু, আর-সকলের মুখের হাসি তখন মিলিয়ে গেছে।

কিন্নির দু'চোখ তখন জলে ভ'রে এসেছে। সে তার সখীদের নিয়ে সেখান থেকে ছুটে চলে গেল। সুখন্, মাথা হেট ক'রে—বসলো গিয়ে একটা গাছের তলায়।

সর্দার বললে: বর আর বরযাত্রীর দল আজ এখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে বাড়ী চলে যাবে। আবার আসবে, আগামী পূর্ণিমার দিন। কিন্তু একটি কথা। মুংরা, তুই ভালো ক'রে শোন্।

মুংরা হাসতে-হাসতে সর্দারের কাছে এগিয়ে এলো। সর্দার বললে: আজ এই বিয়ে একরকম বন্ধ হলো—তোরই কথায়। তোর মা, গরীব। তার টাকা-পয়সা নেই। আসছে পূর্ণিমার দিন, লোকজনকে খাওয়াবার যা-কিছু খরচ—সবই দিতে হবে, ভূতু মাঝির ছেলেকে।

মুংরা হাসতে-হাসতে বললে: দেবে। আজ যা খরচ হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ হবে সেদিন। আর সে-সব খরচ দেবে, ভূতু মাঝির ছেলে, গারাং মাঝি। আজ আমি চললাম তাকে এই খবরটা দিতে।

বলেই সে তার ঘোড়ার কাছে গিয়ে, চট্ ক'রে তার ওপর চড়ে, বিদ্যুতের মত দিলে ঘোড়া ছুটিয়ে।

সর্দার চেঁচিয়ে বললে: খেয়ে যাবি না ?

মুংরা বললে : না।

আনন্দের আতিশয্যেই হোক্ কিংবা মনের ভুলেই হোক্, মুংরা ফেলে গেল তার বিষ-মাখানো তীর আর ধনুক।

সেদিনের নাচ-গান হাসি আর আনন্দ—সবই যেন্ দপ্ ক'রে নিভে গেল।

খেতে হয় তাই খেলে, কথা বলতে হয় তাই কথাও বললে, তারপর সেই রাত্রেই নিরানন্দ-মনে বর আর বরযাত্রীর দল পা বাড়ালে, পাহাড়-তলির পথে।

কিন্নির মা, কত কান্নাই না কাঁদলে। কাঁদলে আর অভিশাপ দিলে নিজের পেটের সন্তানকে। দুঃখের দিনে একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করে না যে-ছেলে, সে-ই আজ তার চরম শত্রুতা ক'রে দিয়ে চলে গেল! মানুষের এর চেয়ে সর্বনাশ আর কি হতে পারে!

কারও সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক্, লজ্জায় সে কারও মুখের পানে মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না!

হোক্ তার নিজের সন্তান, তবু সে আজ মা হয়ে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে—হে ভগবান! এর শাস্তি তুমি তাকে দিও!

রাতটা কোনরকমে কেটে গেল। কিন্তু তার পরের দিন—তাকে এখানে দেখা গেল না।

একমাত্র কিন্নি জানলে, সে কোথায় গেছে। আর কেউ কিছুই বলতে পারলে না।

বরযাত্রীদের সঙ্গে আগেই এসে পৌঁছেচে সুখন্! কাজেই তার মা এই নিদারুণ সংবাদটা শুনেই বললে : আজই আমি যাচ্ছি, সইএর কাছে।

সুখন্ বললে : তার আগে, আমি কি ঠিক করেছি শোন্।

তার মা বললে : বল্।

সুখন্ বললে : বিয়ে করতে গিয়ে আমরা ফিরে এসেছি। আমাদের অপমান করা হয়েছে। আমরা এতগুলো জোয়ান্ সাঁওতাল আছি এখানে। আমরা এ অপমানের প্রতিশোধ নেবো। ওদের চোখের সুমুখ থেকে জোর ক'রে তুলে নিয়ে আসবো মেয়েটাকে! এনে এইখানে বিয়ে করবো। ওদের সর্দারের কথা আমরা শুনবো না। আমাদের সর্দারকে এই কথাটা—

কথা তখনও শেষ হয়নি, এমন সময় কিন্নির মা এসে হাজির!

সুখনের মা বললে : ওই ছাখ, সই নিজেই এসে গেছে। জোর করে মেয়েকে আনতে হবে না, বাবা। এর ব্যবস্থা যা করবার, আমরাই করছি।

সুখনদের এই পাহাড়তলি-গ্রামখানি দেখতে ঠিক ছবির মত। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ছোট্ট একটি নদী, সাঁওতালদের এই পাহাড়তলি-বস্তিটিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে চলে গেছে, সোজা পূর্বদিকে। বহু দূরে গিয়ে মিশেছে, অজয় নদীর সঙ্গে।

নদীর দুই তীরে কত রকমের কত গাছ। শাখা-পল্লব নুয়ে পড়েছে জলে। নদীর জল কিন্তু বারো মাস থাকে না। বর্ষায় শুধু দুকূল ছাপিয়ে ভরা-নদী বয়ে চলে প্রচণ্ড বেগে। তারপর শরৎকাল পার হতে না-হতেই নদীর জল যায় শুকিয়ে। সাদা বালি ঝিক্‌মিক্‌ করে সূর্যের আলোয়।

পাহাড়তলির আর-এক নাম, সাত-ঘরা পাহাড়তলি। এই নামের একটি ইতিহাস আছে। এখানে যদিও তা' অবান্তর, তবু জেনে রাখা ভালো।

কোথায় কোন্‌ দূর-দূরান্তরের জঙ্গল থেকে সাতটি সাঁওতাল-পরিবার এখানে এসে সর্বপ্রথম বসবাস করতে থাকে। কিন্তু একটুখানি জমিতে ফসল ফলিয়ে, বনের পাখী আর কাঠবিড়ালী মেরে, বারো মাস জীবন ধারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

জমি আছে, কিন্তু জল নাই। শুধু বর্ষার জলের ভরসা কম।

সাত-ঘরের মধ্যে দু'ঘর যায় উঠে। জীবিকার অন্বেষণে চলে যায়, কয়লা-কুঠির দেশে। বাকি পাঁচ-ঘর কিন্তু এখানকার মনোরম প্রকৃতির মায়া পরিত্যাগ করতে পারে না। নিজেদের গায়ের জোরে, মরা নদী খুঁড়তে সুরু করে।

মানুষের অসাধ্য কিছু নেই।

কয়েক বৎসর পরে সাত-ঘরা পাহাড়তলির রূপ যায় বদলে। বর্ষার জল এমনভাবে বাঁধা পড়ে যে, নদীর তিন-চার জায়গায় প্রচুর জল, বারো মাস থৈ-থৈ করতে থাকে। আর সেই জলে, পাহাড়তলির বহু বিস্তৃত ভূমি-খণ্ড—শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে।

নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে, প্রচুর পরিমাণ উদ্বৃত্ত ফসল তারা বিক্রি ক'রে আসে পাঁচ ক্রোশ দূরের এক হাটে।

এই 'সাত-ঘরার' মধ্যে যে পাঁচ-ঘর এখানে ধীরে-ধীরে তাদের ভাগ্য

পরিবর্তন করে সঙ্গতিপন্ন হয়ে উঠলো, তাদেরই মধ্যে একঘর—সুখনের পিতামহ।

পাহাড়তলিতে এখন আর মাত্র পাঁচ-ঘর সাঁওতাল বাস করে না। এখন সেই পাঁচ হয়েছে—পঞ্চাশ।

সুখন্ বিয়ে করতে গিয়ে, ফিরে এয়েছে। এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে, কিন্নিকে জোর ক'রে তুলে আনবার প্রয়োজন হলো না।

চার-পাঁচদিন পরেই একদিন দেখা গেল, কিন্নিকে নিয়ে কিন্নির মা, পাহাড়তলির একখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাটির ঘরে, রীতিমত তার সংসার পেতে বসেছে।

স্বাস্থ্যবতী কিন্নি, গাছ-কোমর বেঁধে, হেসে-হেসে কাজ করছে।

কুড়ুল দিয়ে, জ্বালানী কাঠ কাটছিল কিন্নি।

কিন্নির মা আর সুখনের মা—দুই সই, দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে আর হাসছে।

কিন্নির মা বললে: ছেলে তো আমার থেকেও নেই। ও-ই তো আমার ছেলের কাজ করে। এখন তো তোর বৌ হলো, তোর যা খুশী তাই করাস্।

সুখনের মা বললে: আমার ঘরে ওকে ভাত-রাঁধাবো, কাঠ কাটাবো না। তবে আমরা সাঁওতালের মেয়ে, আমরা সব কাজ করতে পারি।

কিন্নির মা বললে: কিন্নির বাবা মরে যাবার পর, তুই তো জানিস্, আমাকে সবই করতে হয়েছে। তীর-ধনুক্ নিয়ে পাখী মেরেছি, সেই পাখীর মাংস রান্না করে ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে খাইয়েছি। সে কি —একদিন দু'দিন? মাসের পর মাস। চাল কোথায় পাবো? দয়া করে কেউ যদি দু-মুঠো দিতো তো, ভাত রাঁধতাম। তুই তো সবই জানিস সই! ছেলেটা ভাত-ভাত করে চ্যাঁচাতো, তাই আগে ছেলেটাকে খাওয়াতাম। নিজের জন্যে কিছু থাকতো তো খেতাম, নইলে—উপোস করেই দিন কাটাতো। এমনি করে এত কষ্টে মানুষ-করা ছেলে ওই হতভাগা মুংরা, কি-রকম বেইমান হয়েছে ত্যাখ।

বল্‌তে-বল্‌তে, ঝর্-ঝর্ করে কেঁদে ফেললে, কিন্নির মা

সই বললে: চুপ কর্। কেঁদে কি হবে?

কিন্নির মা কাঁদতে-কাঁদতে বললে: চুপ করতে পারছি না সই। যার

অমন জোয়ান্ ছেলে—কানা নয়, খোঁড়া নয়, বোকা নয়, হাবা নয়; আজ তার মা কিনা, মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে থাকতে এলো।

সই বললে: ও-কথা না-ভেবে তুই এ-ও তো ভাবতে পারিস—তুই এলি তোর বন্ধু, সইএর বাঁড়ীতে থাকতে।

কিন্নির মা বললে: তাই তো ভাবছি ভাই!

সই বললে: আর কিন্তু দেরি করা ভালো নয়। তোর ছেলেটা ঠিক সেই ভুতু ডাকাতের দলে মিশেছে। হতভাগাকে, বিশ্বাস নেই। আমি কালই ব্যবস্থা করছি।

সুখনের মা'র ব্যবস্থা করতে আর কতক্ষণ!

ব্যবস্থাটা অবশ্য খুব ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হলো না। হলো একরকম চুপিচুপিই।

পাহাড়তলির বুড়ো সর্দারকে ডাকা হলো; আর ডাকা হলো, সুখনের বন্ধুদের। অর্থাৎ, পাহাড়তলির সবাই জানলে। জানলে, বিয়েটা চুপিচুপি চুকে যাবে আজ। তারপর গান-বাজনা খাওয়া-দাওয়া হৈ-হুল্লোড় হবে—কাল।

সুখন্‌দের মস্ত-বড় খামারের একপাশে—কিন্নির মাকে যেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছে, সেইখানে বসলো বিয়ের আসর।

শালগাছের খুঁটি আর খড় দিয়ে মণ্ডপ তৈরী হয়েছে। সেই মণ্ডপের নীচে, বড়-বড় দুটো কাঠের পিঁড়ির ওপর বসেছে, একদিকে বর—আর, একদিকে কন্নে। সাঁওতালদের চিরাচরিত নিয়মে, বুড়ো সর্দারের ছেলে, ছোট সর্দার—বিয়ের মন্ত্র আওড়ে চলেছে।

কিন্নির মা, দূরে তার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে, আর তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে আসছে।

তার সই এসে দাঁড়ালো তার কাছে। বললে: কাঁদছিস্ কেন শুধু-শুধু?

এ কথার আর কি জবাব দেবে? আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে, দড়ির খাটিয়াটা পাতলে সেইখানে। পেতে বসলো দুই বন্ধু—পাশাপাশি।

দোরের পাশে রয়েছে একটি চমৎকার ধনুক আর গোটা-দশেক তীর।

সুখনের মা বললে: ও-গুলো ওখানে কেন?

কিন্নির মা বললে: ওইগুলোই তো ফেলে গেছে মুংরা। ওইগুলো দেবো সুখন্‌কে। তুই-ই তো বললি।

সই বললে : হ্যাঁ। সুখন্ ভারি খুশী হবে।

কিন্নির মা বললে : তীরগুলো কিন্তু মনে হচ্ছে—বিষ দিয়ে পায়েন্ করা।

—ভালোই তো!

—ভালো, কিন্তু ওই দিয়ে পাখী মারলে, সে-পাখীর মাংস খাওয়া চলবে না।

সই বললে : দেবার সময়, সে-কথা ব'লে দিবি তোর জামাইকে।

ওদিকে বিয়ে চলছে। এদিকে দুই মা, গল্প করছে। এখানে-ওখানে দু'চারজন সাঁওতাল ছেলে-মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে। চারিদিকে জ্যোৎস্নার আলো। ফুর্-ফুর্ করে মিষ্টি-মিষ্টি হাওয়া বইছে। গাছের শাখায়-পাতায় সেই হাওয়া লেগে কেমন যেন একটানা একটা আওয়াজ হচ্ছে।

জ্যোৎস্নার আলোয়, গাছের নীচে ছায়া পড়েছে। ছায়াটা মনে হচ্ছে যেন, জমাট-বাঁধা অন্ধকার।

নদীর ধারে কয়েকটা কুকুর হঠাৎ ডেকে উঠলো।

সে ডাক, থামছে না। বরং বাড়ছে ক্রমাগত।

কিন্নির মা জিজ্ঞাসা করলে : এত কুকুর ডাকছে কেন?

সই বললে : জঙ্গল থেকে কোনও জানোয়ার বেরিয়েছে হয়তো। এখানে ও রকম ডাকে মাঝে মাঝে।

কিন্তু, কিন্নির মা সেই আওয়াজের দিকে কান খাড়া করেই রইলো। সই কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে, তার জবাব পর্যন্ত দিলে না।

সই বললে : কি ভাবছিস্?

কিন্নির মা বললে : আমার ছেলেটাকে যে ভয় করে।

সই বললে : এখানে ও-সব চালাকি চলবে না। পাহাড়তলির সাঁওতালদের তো—চেনে না!

কিন্নির মা বললে : কিন্তু, তাদের কাউকে বলা হয়নি যে!

সই বললে : তোর তীর-ধনুক রয়েছে তো হাতের কাছে। খুব যে সেদিন বড়াই করছিলি।

—ঠিক বলেছিস্।

ব'লে, কিন্নির মা যেই সেখান থেকে উঠে গিয়ে ধনুকের ছিলাটি টেনে লাগাবার চেষ্টা করেছে, আর ঠিক তার সঙ্গে-সঙ্গে—

মা'র মন যা আশঙ্কা করেছিল—দেখতে-দেখতে চোখের সুমুখে ঘটে গেল ঠিক তাই।

ঘরের পেছন থেকে, বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে এলো একটা লোক। কোনোদিকে না তাকিয়ে, কিন্নিকে আড়কোলা ক'রে তুলে নিয়ে গিয়ে, ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে—দে ছুট্!

ঘটনাটা ঘটে গেল—অতর্কিতে।

পিঁড়িটা উল্‌টে গিয়ে, সুখন্ যদি হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে না যেতো, অনায়াসে কিন্নিকে সে ধ'রে ফেলতে পারতো, কিন্তু পারলে না।

সবাই চীৎকার করতে লাগলো, কুকুরের ডাক সুরু হয়ে গেল চারিদিকে। কয়েকটা কুকুর ছুটলো তাদের পিছু-পিছু।

জোয়ান সাঁওতাল-ছেলেরা দলে-দলে বেরিয়ে এলো—লাঠি, সড়কি আর বল্লম হাতে নিয়ে। ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা, টিন বাজিয়ে বিপদের বার্তা জানিয়ে দিতে লাগলো।

টিলার ওপর থেকে হঠাৎ একটা শিঙ্গার আওয়াজ শোনা গেল। নৈশ-নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে সে প্রচণ্ড আওয়াজে মনে হলো যেন পাহাড়তলি কেঁপে উঠলো।

চারিদিকে চাঁদের আলো। কিন্তু, ঢেউ-খেলানো প্রান্তরের উপর ছোট বড় গাছের আড়াল দিয়ে, কিন্নিকে তুলে নিয়ে ঘোড়সোয়ার কোন্ পথ দিয়ে পালাচ্ছে—পাহাড়তলির সাঁওতাল-যুবকেরা ঠিক ঠাহর করতে পারছে না। এলোমেলো ছুটে কোনও লাভ নেই, তাই তারা দাঁড়িয়ে পড়েছে এক-জায়গায়।

কিন্তু, ঠাহর যারা করবার, তারা ঠিক করেছে। কিন্নির মা আর সুখনের মা, ঠিক চলেছে ঘোড়সোয়ারের পিছু-পিছু।

এতক্ষণ উঁচু-নীচু পথ দিয়ে ঘোড়াটা ছুটে চলেছিল ব'লে, তীর চালাবার সুবিধা হচ্ছিলো না।

এইবার চলেছে নদীর পাড় ধ'রে।

কিন্নির মা, চট্ ক'রে বসে পড়লো একটা ক্ষেতের ধারে। ধনুকে তীর লাগিয়ে, চীৎকার করে বললে: "মুংরা, এখনও থাম্, এখনও বলছি কিন্নিকে ফিরিয়ে দে।

কিন্তু, কে কার কথা শোনে!

কিন্নির মা ছাড়লে হাতের তীর !

লাগলো না।

আবার তীর ছুটলো, বিদ্যুতের মত।

কিন্তু, এবারও লাগলো না।

ঘোড়া ছুটেছে, বিদ্যুৎবেগে।

কিন্নির মা উঠে দাঁড়ালো। সেও ছুটলো তার পিছু-পিছু।

এবার তার অব্যর্থ সন্ধান !

সড়াৎ করে তীর ছুটে গেল ধনুকের ছিলা থেকে। সই বলে উঠলো—

সাবাস্ !

ঘোড়াটা ছুটতে-ছুটতে, সুমুখের পা দুটো তুলে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো চীৎকার করে। তারপরেই দু'বার পাক্ খেয়ে, শুয়ে পড়লো সেইখানে।

তীর লেগেছে ঘোড়ার গায়ে।

কিন্তু, ওরা কোথায় ? কোথায় মুংরা, কোথায় কিন্নি ?

যে লোকটা ঘোড়া থেকে ছিট্‌কে পড়লো, সে উঠে দাঁড়ালো। সে তো মুংরা নয় ! ঘোলাটে জ্যোৎস্নার আব্‌ছা আলোয় দূর থেকে চিনতে পারেনি।

এখন তারা খুব কাছে এসে পড়েছে।

লোকটা অপরিচিত। এইটেই বোধহয় সেই ভুতু সর্দারের ছেলে।

সে তার হাতের তীর-ধনুক বাগিয়ে ধরে, ঘোড়াটার কাছে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে। ডাকলে : মুংরা !

মুংরার মা, তার সইএর হাত ধ'রে টেনে, চষা-ক্ষেতের আলের আড়ালে জোর করে বসিয়ে দিলে। নিজে তার আগেই ব'সে পড়েছে।

ঘোড়ার জিন্‌টা খুলতে-খুলতে লোকটা আবার ডাকলে : মুংরা !

হঠাৎ চাপা-কান্নার আওয়াজ এলো কানে।

সই তার সইএর হাতের ওপর চিম্‌টি কেটে চুপিচুপি বললে : ওই শোন্ ! আওয়াজটা আসছে যেন নদীর ওপার থেকে। কিন্নির কান্না। ক্রমশঃ এগিয়ে-এগিয়ে আসছে।

শুক্‌নো নদী পার হয়ে, কিন্নিকে নিয়ে মুংরার ঘোড়াটা এক্ষুনি এসে পড়বে এই লোকটার কাছে।

কিন্নির মা বললে : দু'জনেরই হাতে তীর-ধনুক আছে। তখন আর সামলাতে পারবো না। তার চেয়ে, দিই এই লোকটাকে শেষ ক'রে।

সইএর হাত থেকে একটা তীর দিয়ে, ধনুকে লাগিয়ে যেই ছেড়ে দেওয়া—সড়াৎ ক'রে তীর লাগলো গিয়ে তার বুকে।

যেই লাগা, আর সঙ্গে-সঙ্গে 'মা' বলে লোকটা উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়লো তার ঘোড়ার ওপর। সেই-যে পড়লো, আর উঠলো না।

কিন্নির মা যা ভেবেছিল ঠিক তাই হলো। মুংরার ঘোড়া, শুকনো নদী পার হয়ে এলো এ পারে। এসেই ডাকলে: গারাং!

মরা ঘোড়ার ওপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে গারাংএর মৃতদেহ। কে সাড়া দেবে?

কিছুক্ষণ আগে যে লোকটা তাকে 'মুংরা' বলে ডাকলে, সে যে এরই মধ্যে এমনি করে মরে যেতে পারে, মুংরা সে কথা ভাবতে পারলে না।

কিন্নিকে বললে: খবরদার বলছি, ঘোড়া থেকে নামবি না—পালাবার চেষ্টা করবি না। আমার হাতে আছে বিষ-কাঁড়—একবারে মেরে ফেলবো।

এই বলে মুংরা নামলো ঘোড়া থেকে।

কিন্নি সে কথা শুনলে না। বললে: মারো তুমি, আমার মরাই ভালো।

ঘোড়া থেকে নেমেই কিন্নি, ছুটতে আরম্ভ করলে।

মুংরা তৎক্ষণাৎ তার ধনুকে তীর লাগিয়ে, চীৎকার ক'রে উঠলো কিন্নি! কিন্নি! এখনও বলছি—পালাস্ নে, থাম্! এখনও—

কথাটা তার শেষ হলো না। সড়াৎ করে একটা তীর এসে লাগলো তার বুকের ওপর। হাতের তীর তার, হাতেই রইলো। থর্-থর্ করে কাঁপতে-কাঁপতে সেইখানেই সে ঘুরে পড়ে গেল।

তার মা তখন তার হাতের ধনুক্ ছুড়ে ফেলে দিয়ে, সেইখানে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে আর বলছে: এ তুমি কি করালে ভগবান, মা হয়ে, নিজের হাতে ছেলেকে খুন করলাম···

ছুটতে-ছুটতে কিন্নি, থমকে থামলো। মনে হলো, তার মা যেন কাঁদছে। ডাকলে: মা!

সুখনের মা বললে: আয়!

কিন্নি ছুটে গিয়ে, কাঁদতে-কাঁদতে আছাড় খেয়ে পড়লো মার কাছে।

মা বললে: তোকে বাঁচাতে গিয়ে কি আমি করলাম—ওই ভাখ।

—বেশ করলি, ও আর দেখতে হবে না। চল্।

সুখনের মা একরকম জোর ক'রেই তাদের নিয়ে গেল পাহাড়তলিতে।

দিনকতক পরে একদিন দুপুরবেলা, হাওয়া-গাড়ীতে চড়ে কয়েকজন পুলিশের লোক পাহাড়তলিতে এসে হাজির।

পাহাড়তলির পথে, হাওয়া-গাড়ীর চাকার দাগ এই বুঝি প্রথম পড়লো।

আবাল-বৃদ্ধ বনিতা ছুটে জড়ো হলো, হাওয়া-গাড়ী দেখতে।

পুলিশ এসেছে, দু'জন পলাতক আসামীর সন্ধানে। তারা নাকি, ঘোড়ায় চড়ে যেখানে সেখানে চুরি ডাকাতি আর রাহাজানি করে বেড়ায়।

পুলিশের লোক জানতে চায়, তারা এখানে এসেছিল কি না।

সাঁওতালেরা সহজে মিথ্যা কথা বলে না, পাহাড়তলির সাঁওতালেরা জীবনে বোধহয় এই প্রথম মিথ্যা বললে।

বললে: না, আসেনি।

পুলিশের বড়বাবু—যিনি সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি বলে গেলেন: কোনোদিন যদি তারা আসে তো, ধরে রেখো। ধরে রেখে, দুমকার পুলিশথানায় খবর দিও, পুরস্কার পাবে।

কাছাকাছি একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, কিন্নির মা—কথাগুলো শুনছে, আর তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে আসছে!

মনে হচ্ছে—ছুটে গিয়ে তাকে জানিয়ে দিয়ে আসে—ভবিষ্যতে তারা আর কোনদিনই আসবে না, তাদের সমস্ত চিহ্ন এ পৃথিবী থেকে চিরদিনের তরে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। মা হয়ে, নিজের হাতে তার সন্তানকে হত্যা করেছে!…

কিন্নি ডাকলে: মা!

মা, তার দিকে ফিরে চাইতেই কিন্নি বললে: ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছো, ঘরে এসো!

মা, ঘরে গিয়ে ঢুকলো। পুলিশের গাড়ীটাও চলে গেল।

মা বললে: ওরা আর আসবে না এখানে। আসবার দরকারও হবে না।

বলতে-বলতে চোখ দুটো আবার জলে ভরে এলো।
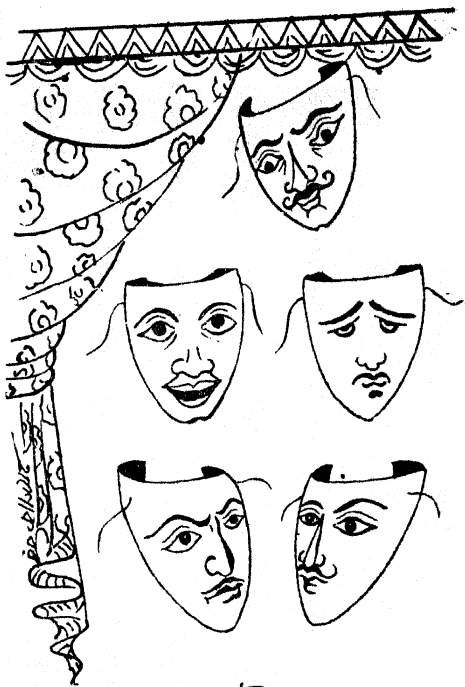
নাটক

আর এক সিরাজ

প্রথম দৃশ্য

রাত প্রথম প্রহর পার হয়ে গেছে। সারা গ্রাম স্তব্ধ। একখানি ঘরের মধ্যে মা ও ছেলে ঘুমুচ্ছে। ঘর অন্ধকার।

মা। খোকা খোকা—সিরাজ!

সিরাজ। কি? মা আমায় ডাকছ?

মা। হ্যাঁ। বাইরে কিসের যেন একটা শব্দ হলো।

সিরাজ। শব্দ?

মা। হ্যাঁ, কে যেন উঠোনে লাফিয়ে পড়লো।

সিরাজ। কে?

মা। কোন লোক বোধ হয়।

সিরাজ। [সভয়ে] কোন লোক? না না, মেনি বেড়ালটা বোধ হয়।

মা। না না বেড়াল নয়, মানুষ বলে মনে হল। [উঠে বসলেন।]

সিরাজ। মানুষ এই রাতে—আমাদের উঠানে?

মা। দাঁড়া আমি দরজাটা খুলে একবার দেখি—

সিরাজ। [সভয়ে] না না, দরজা খুলে তুমি বেরিও না মা, আগে জানালাটা খোলো—

[মা তক্তা থেকে নেমে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।]

সিরাজ। কাউকে দেখছ?

মা। হুঁ।

সিরাজ। চোর?

মা। [বাইরের উদ্দেশ্যে] দাঁড়াও খুলছি। [দরজা খুলতে গেলেন।]

সিরাজ। না না—

[মা দরজা খুললেন। অন্ধকারে একজন লোক ভিতরে প্রবেশ করলো।]

সিরাজ। কে? কে?

আগন্তুক। আমি।

সিরাজ। আমি! বাবা?

[আগন্তুক দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর এসে বসলেন তক্তার এক পাশে।]

আগন্তুক। আলোটা জ্বালো।

[মা একটা পিদিম জ্বাললেন।]

বাবা। মেদিনীপুর থেকে আসছি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে।

মা। আওয়াজ শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছে যে এ মানুষ। আর চোর যে আমার এখানে আসবে না তা আমি ভালমত জানি। এলে পাবে কি?

বাবা। [পকেট থেকে ঘড়ি বের করে] রাত এগারোটা বেজেছে। সারা গাঁ নিঝুম হয়ে গেছে, তাই আসবার সুবিধা হলো। আবার ফর্সা হবার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে।

সিরাজ। এখনি চলে যাবে বাবা?

বাবা। হ্যাঁ, তোকে দেখবো বলেই এসেছি। গাঁয়ের মানুষ জেগে ওঠার আগেই চলে যাবো। পুলিশের নজরকে ফাঁকি দিয়ে যেতে হবে তো?

সিরাজ। এ গাঁয়ে পুলিশ কোথায়?

বাবা। যার চোখে পড়বে সেই পুলিশকে জানাবে। তাতে বিপদ বাড়বে। কে আর ইচ্ছা করে নতুন বিপদে পড়তে চায় বল্?

সিরাজ। এই রাতে তুমি ঘুরে বেড়াও, তোমার ভয় করে না?

বাবা। ভয় করবে কেন? ভয় ভাঙার ওষুধ যে আমার কাছে আছে।

[পকেট থেকে পিস্তল বের করে ছেলেকে একবার দেখালেন। তারপর বললেন:]

এটটি কাছে থাকতে রজনী মজুমদার কাউকে ভয় করে না।

সিরাজ। দেখি না বাবা—

মা। না না, গুলি ভরা আছে—

রজনী। থাক না, মরতে ভয় পাও নাকি ?

মা। আমি এখন মরলে সিরাজের কি হবে ? কে ওকে দেখবে।

[রজনী পিস্তলটা সিরাজের হাতে দিলেন।]

সিরাজ। গুলি ভরা আছে বাবা ?

রজনী। হ্যাঁ। [পিস্তল ফেরৎ নিলেন]

মা। এ কী তোমার চেহারা হয়েছে ? ক'দিন খাওনি ?

রজনী। চারদিন আমার ভাত খাওয়া হয়নি।

মা। আমি এখনি দু'মুঠো ফুটিয়ে দিই ?

রজনী। তাই দাও। আমি বসি।

[মা পিদিম নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।]

সিরাজ। বাবা ?

রজনী। কি ?

সিরাজ। তুমি স্বদেশীর লোক। পুলিশের সঙ্গে লড়াই কর। কেন বাবা ?

রজনী। আমার লড়াই বিদেশী রাজার সঙ্গে তাদের জন্যেই আজ আমাদের এতো দুঃখ। পুলিশ বিদেশীর মাইনে করা লোক, তাই পুলিশের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া বাধে।

সিরাজ। কবে এই লড়াই শেষ হবে বাবা ?

রজনী। যখন এই বিদেশী রাজা দেশ ছেড়ে চলে যাবে

সিরাজ। সে কবে বাবা ?

রজনী। জানি না।

সিরাজ। তুমি তাহলে বাড়ী আসবে কবে ?

রজনী। লড়াই যেদিন থামবে।

সিরাজ। যদি না থামে ?

রজনী। তাহলে আসবো না।

সিরাজ। আর তাহলে আসবেই না ?

রজনী। আসবো—আসবো। তুই ভাবিস্ না। তুই এখন ঘুমো।

সিরাজ। বারে বাঃ, তুমি কতদিন পরে এলে, এখনি চলে যাবে, আর আমি ঘুমুবো ? তোমার সঙ্গে কথা বলবো না ?

রজনী। বেশ, তাহলে তুই কথা বল্ আমি শুনি।

[খানিকক্ষণ সব চুপচাপ।]

রজনী। সিরাজ!

সিরাজ। বাবা।

রজনী। কই আর কথা বলছিস্ না যে?

সিরাজ। কি বলবো তাই ভাবছি।

রজনী। তুই রোজ ইস্কুলে যাচ্ছিস্? ঠিকমত পড়াশুনা করছিস্?

সিরাজ। হাঁা বাবা। আমি এবার ফার্স্ট হয়েছি। বাংলায় পেয়েছি একশো। অঙ্কেও একশো।

রজনী। বেশ। ভাল করে পড়াশুনা কর, বড় হয়ে তোকেও লড়তে হবে।

সিরাজ। না বাবা, আমি ও পিস্তল নিয়ে লড়বো না। আমি লড়বো বড় বন্দুক নিয়ে, কামান নিয়ে, ট্যাংক নিয়ে, মেসিন গান নিয়ে—

রজনী। তাহলে তো খুব ভাল লড়াই হবে।

সিরাজ। তোমার ওইটুকু পিস্তলের জন্যেই তোমরা পেরে উঠছ না বাবা। ওদের কত বড় বড় বন্দুক,—

রজনী। তা হবে!

সিরাজ। তোমরা বন্দুক জোগাড় কর না কেন বাবা?

রজনী। বন্দুক তো পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায় না সিরাজ!

[মা ভাতের হাঁড়ি নিয়ে ঘরে এলেন।]

মা। সিরাজ, পিদিমটা নিয়ে আয়।

[সিরাজ আলোটা বাইরে থেকে নিয়ে এলো।]

রজনী। আলোটা একটু আড়াল করে দাও। বাইরে থেকে যেন কারও চোখে না পড়ে।

মা। এতো রাতে আর কে দেখছে?

রজনী। তবু যদি কারও নজরে পড়ে—

[মা পিদিমের একপাশে একখানি হাতপাখা আড়াল করে দিলেন।]

মা। নাও, হাত ধুয়ে খেতে বস্যো। গরম গরম খেয়ে নাও, আলু ভাতে আর মুগের ডাল ভাতে, আর কিছু নেই।

রজনী। পেঁয়াজ আর কাঁচা লংকা?

মা। সে আছে।

রজনী। তাহলে আর কথা কি, অমৃত।

[এক ঘটি জল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এলেন। সিরাজি তক্তা থেকে নেমে গামছাখানা এগিয়ে দিল।]

রজনী। বাঃ, ভেরী গুড বয়! [পিঠ চাপড়ে দিলেন তারপর হাত মুখ মুছে খেতে বসলেন।]

মা। তুমি আসবে জানলে একটু মাছের ব্যবস্থাও করতে পারতুম।

রজনী। জানিয়ে আসার কোন পথ আর খোলা নেই, যখনই আসবো এইভাবেই আসতে হবে।

মা। কিন্তু কতদিন এইভাবে কাটবে?

রজনী। যে কাজের ভার নিয়েছি, যে পথে চলেছি সে পথ তো সোজা নয়, দুঃখ-দুর্ভোগ তো সইতেই হবে।

মা। সে কতদিন?

রজনী। পরাধীন দেশ যতদিন না স্বাধীন হয়। এতদিনে সব ঠিক হয়ে যেতো, হয়নি শুধু বিশ্বাসঘাতক বেইমানদের জন্যে। এতদিনের পরাধীনতা দেশের মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে।

মা। এ কি আর কোনদিন ভাল হবে?

রজনী। নিশ্চয় হবে। দেশ স্বাধীন হবার পর দেখবে দেশের চেহারা যাবে বদলে।

মা। তখন আর মানুষের দুঃখ কষ্ট কিছু থাকবে না?

রজনী। কিচ্ছু না।

মা। ভগবান যেন তাই করেন। [দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম।]

[আহার শেষ করে রজনী উঠলেন। বাইরে থেকে মুখ ধুয়ে এলেন। মা একটু হরিতকি দিলেন মুখশুদ্ধি।]

মা। পান সুপুড়ি তো নেই।

রজনী। দরকার নেই। সে সব পুরাণো অভ্যাস আর কিছু নেই।

[ঘড়ি দেখলেন।]

মা। ক'টা বাজলো?

রজনী। বারোটা।

মা। এখন তাহলে খানিক ঘুমিয়ে নাও।

রজনী। ভয় হয়, যদি ঘুম ভাঙতে দেরী হয়।

মা। কোন ভয় নেই। তিন পহরের শিয়াল ডাকলেই আমি জাগিয়ে দোব।

রজনী। আবার তুমিও যদি ঘুমিয়ে পড় ?

মা। না গো না, ঘুমুবো না। তুমি বিপদে পড়বে জেনেও আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুবো ?

রজনী। বেশ, তাহলে আলোটা নিভিয়ে দাও, আমি শুয়ে পড়ি।

[সিরাজের পাশে শুয়ে পড়লেন।]

সিরাজ। আমি জেগে থাকি বাবা, মা যদি আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

রজনী। না না, তুই শো, তোর রাত জাগলে অসুখ করবে।

সিরাজ। আমি ঘুমুবো আর তুমি চলে যাবে ?

রজনী। না বাবা, যাবার সময় আমি তোকে বলে যাবো।

সিরাজ। ঠিক ?

রজনী। ঠিক।

[সিরাজ শুয়ে পড়লো।]

মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে শুধু ঘড়ির কাঁটার টিক টিক শব্দ।

কোন এক সময় নেপথ্যে শিয়ালের ডাক শোনা গেল।

ডাক থামতেই ঘড়িতে বাজলো রাত তিনটে—ঢং ঢং ঢং!

আবার মঞ্চের উপর আলো জ্বলে উঠলো।

দেখা গেল রজনীবাবু তক্তার উপর বসে আছেন।

রজনী। রাত তিনটে বাজলো।

মা। এখনি যাবে ?

রজনী। হ্যাঁ। সকাল হবার আগেই অজয় পার হয়ে যেতে হবে। আর দেরী করা ঠিক হবে না।

মা। সে তো অনেক পথ।

রজনী। তিন ক্রোশ তো হবেই। এখন থেকে হাঁটতে সুরু করলে ভোরের আগেই পৌঁছে যাবো।

মা। খোকাকে তাহলে ডাকি ?

রজনী। আমি ডাকছি, তুমি আমায় এক গেলাস জল দাও, আর এই জলের বোতলটা ভরে দাও—

['সিরাজের গায় হাত দিয়ে] খোকা —সিরাজ—

সিরাজ। [উঠে পড়ে] বাবা।

রজনী। আমি চললুম খোকা। তুই ভাল করে লেখাপড়া শেখ। ভাল ছেলে হ'। আর আমি যে এখানে এসেছিলাম সেকথা কেউ যেন না জানতে পারে।

সিরাজ। আমি কাউকে বলবো না বাবা।

রজনী। [জল খেলেন। তারপর জলের বোতলটা হাতে নিলেন। সিরাজের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিলেন]

আমি চলি—

[সিরাজ প্রণাম করলো।

রজনী ক্ষণেক থামলো তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

মা ও সিরাজ দরজার সামনে এসে তাকিয়ে রইলেন অন্ধকারের পানে।]

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রামের পাশের মাঠ। মাঠের পাশ দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে।

লাইনের ধারে বসে আছে সিরাজ। একা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

ধীরপদে পাশে এসে দাঁড়ালো সহপাঠী বিমল।

বিমল। সিরাজ, এখানে চুপ করে বসে আছিস, আজ খেলতে যাসনি কেন?

সিরাজ। আমার মনটা আজ ভাল নেই।

বিমল। কেন, কি হলো?

সিরাজ। কিছু না এমনি।

[বিমল পাশে বসে পড়লো।]

বিমল। তোকে আজ কেমন যেন মনমরা দেখছি।

সিরাজ। মনটা ভাল নেই, ভাই।

বিমল। কি হোল? তোর মা বকেছে বুঝি?

সিরাজ। না। মা বকবে কেন, মা বিরক্ত হন এমন কোন কাজ আমি কোনদিন করিনি।

বিমল। তবে কি হোল ?

সিরাজ। কিছু না।

বিমল। না। তুই আমাকে সত্যি বল্ কি হয়েছে।

সিরাজ। কি বলবো ?

বিমল। কি জন্যে তোর মন খারাপ ভাই ?

সিরাজ। আজ বিশে জানুয়ারী, আজ আমার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী

বিমল। ওঃ। কিন্তু তোর বাবা তো এখানে মারা যান নি ?

সিরাজ। না। বাবা ছিলেন সুন্দরবন অঞ্চলে। সেখান থেকে পুলিশ বাবাকে কোনদিনই ধরতে পারতো না। দলের এক বিশ্বাসঘাতক রেইমান তাদের খবর বলেছিল পুলিশকে। পুলিশ কিন্তু তাদের একজনকেও জীবন্ত ধরতে পারেনি। তারা লড়েছিল, শেষে পুলিশের গুলি খেয়ে বাবা মারা যায়।

বিমল। তোরা খবর পেলি কি করে ?

সিরাজ। ক'দিন পরে পুলিশ এসেছিল আমাদের বাড়ীতে।

বিমল। তাহলে তোর বাবার শেষ কাজ হলো কি করে ?

সিরাজ। শুনলাম 'ডেড বর্ডি' পুলিশ নিয়ে গিয়ে সৎকার করেছিল।

বিমল। বড় দুঃখের ব্যাপার !

সিরাজ। না, দুঃখের কিছু নেই। বিপ্লবীরা এইভাবেই মরে। বাবা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, সেজন্য আমি দুঃখ করবো কেন ? দুঃখ হয় এদেশে এখনও মীরজাফর-জগৎশেঠ-উমিচাঁদরা আছে বলে।

বিমল। ওরা না থাকলে তো এদেশ এতদিনে স্বাধীন হয়ে যেতো।

সিরাজ। এদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে, বড় হয়ে এই মানুষগুলোর সঙ্গে আমি একবার বুঝাপড়া করবো।

বিমল। সে তো অনেক দূরের কথা—

সিরাজ। তাই তো ভাবি—যত ভাবি ততো মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

[একখানি ট্রেন আসছে দেখা গেল।

ঝমঝম্ করতে করতে ট্রেনখানি সামনে দিয়ে চলে গেল।]

বিমল। অন্ধকার হয়ে এলো, এবার বাড়ী চল্।

সিরাজ। এখন বাড়ী গিয়ে কি হবে?

বিমল। কেন, পড়বি না?

সিরাজ। না, আজ তেল নেই, আলো জ্বলবে না। তেল কেনার পয়সাও নেই। অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকতে হবে

বিমল। আমার সঙ্গে চল, আমি বাড়ী থেকে তোকে পয়সা দিচ্ছি—

সিরাজ। না। মা বলেছেন, ধার করবি না, ধার আমরা শুধতে পারবো না। আমাদের মাসে মাত্র দশটি টাকা আয় তাতে যা হয় হোক্।

বিমল। তোকে শুধতে হবে না, আমি তোকে দোব।

সিরাজ। দান করবি? আমি তা নোব কেন?

বিমল। বন্ধু বলে দোব।

সিরাজ। না।

বিমল। তোদের যখন এতো কষ্ট, হেডমাস্টার মশাইকে বলিস্‌নে কেন, ফ্রি করে দিতে। তুই ফার্স্ট বয়, বললেই হবে।

সিরাজ। না। বিপ্লবী রজনী মজুমদারের ছেলে কারও কাছে অনুগ্রহ চাইতে যাবে না।

বিমল। তুই না বললে তিনি জানবেন কেমন করে?

সিরাজ। আমার বাবা দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছে, দেশের মানুষের কর্তব্য নয় কি, আমাদের খবর রাখা? আমাদের কিভাবে চলছে একটু খোঁজ রাখা? আমি না খেয়ে মরবো তবু কারও কাছে মাথা হেঁট করবো না। বিপ্লবীর ছেলে ভিক্ষা চাইতে পারে না। আমাকে নিজের শক্তি দিয়ে নিজের অবস্থাকে জয় করতে হবে--নিজের অধিকার আদায় করে নিতে হবে। আমি তাই করবো।

[চারিপাশে শেয়ালের ডাক উঠলো।
কিছুক্ষণ চুপচাপ।]

সিরাজ। চল, তোর আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে—

[দু'জনে ধীরপদে বেরিয়ে গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

ইস্কুল। টিফিনের ঘণ্টা। ঘর খালি। জানালার ধারে দুটি ছেলে হাইবেঞ্চিতে বসে আছে। সিরাজ ও বিমল। সিরাজ একখানি খাতা পড়ছে, বিমল শুনছে।

ঘণ্টা পড়লো, টিফিন শেষ হলো। ছেলের দল হৈ-হৈ করতে করতে ক্লাসে এসে ঢুকলো।

সিরাজ। আজ এই অবধি থাক। আবার কাল পড়বো।

বিমল। বেশ জমেছে কিন্তু······

হরেন
সুরেন } কি পড়ছিলি ভাই?
দেবেন

সিরাজ। একখানা নাটক।

হরেন। নাটক? থামলি কেন, পড় না?

সিরাজ। না। এখনি ক্লাস সুরু হবে। কাল আবার পড়বো।

হরেন। কাল কেন? আজই আমরা শুনবো, সবাই শুনবো ছুটির পরে। নাটক শুনতে বেশ লাগে।

বিমল। সিরাজের পড়াটাও ভাল।

সিরাজ। বেশ, তাই হবে'খন।

[শিক্ষকের প্রবেশ]

শিক্ষক। গোলমাল কিসের?

সিরাজ। কিছু নয় স্যার।

শিক্ষক। খাতা কিসের?

বিমল। একখানা নাটক স্যার।

শিক্ষক। নাটক?

বিমল। সিরাজ একখানা নাটক পড়ছিল স্যার।

শিক্ষক। নাটক পড়ছিল? সিরাজ?

সিরাজ। স্যার!

শিক্ষক। নাটক পড়ছিলে?

সিরাজ। হ্যাঁ, স্যার।

শিক্ষক। কি নাটক?

সিরাজ। এখনও কোন নাম দেওয়া হয়নি স্যার। পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে লেখা।

শিক্ষক। হাতে লেখা নাটক ?

সিরাজ। হ্যাঁ স্যার।

শিক্ষক। কার লেখা।

বিমল। সিরাজ লিখেছে স্যার।

শিক্ষক। তুমি নাটক লিখেছ ?

[সিরাজ কোন জবাব দিল না।]

শিক্ষক। ভেবেছিলাম তোমার কিছু হবে, কিন্তু আর কিছু হবে না। এখন থেকে এই নাটক নভেল নিয়ে মেতে গেলেই লেখাপড়া খতম। নিজের সর্বনাশ হয়ে যাবে। এসব কোরো না। দেখি খাতাখানা ?

[সিরাজ খাতা দিল।
শিক্ষক পাতা উল্‌টে দেখলেন।]

শিক্ষক। খাতাখানা এখন আমার কাছেই থাক্‌, আমি পড়ে দেখি। এখন সব বসো, বই খোলো—

[শিক্ষক পড়াতে সুরু করলেন।]

পর্দা পড়লো।

পরক্ষণেই পর্দা উঠলো।

সেই একই দৃশ্য। তবে ক্লাসে এখন অন্য শিক্ষক।

হেডমাস্টার মশাই প্রবেশ করলেন।

হেড। সিরাজ!

সিরাজ। স্যার!

হেড। এই খাতা তোমার ?

সিরাজ। হ্যাঁ স্যার।

হেড। নাটক কি তুমি লিখেছ!

সিরাজ। হ্যাঁ স্যার।

হেড। সত্যি বলছ ?

সিরাজ। মিছে কথা আমি বলি না স্যার।

হেড। এই নাটক আমি পড়েছি। আমার খুব ভাল লেগেছে। বেশ লিখেছ। ছ'মাস পরে আমাদের ইস্কুলে সমাবর্তন উৎসব হবে, সেই

উৎসবে তোমার এই নাটক, এই ক্লাসের ছেলেরা অভিনয় করবে। আমি সব ব্যবস্থা করে দোব। এই খাতাখানা এখন আমার কাছে থাক, আমি আর একবার পড়ে নিই।

[ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। সারা ক্লাস স্তব্ধ।]

চতুর্থ দৃশ্য

সিরাজের বাড়ীর ঘর।

সিরাজ শুয়ে আছে তক্তাপোষের উপর। মা বসে আছেন মাদুরে।

একদল ছেলের প্রবেশ।

ছেলেরা। কেমন আছিস, সিরাজ?

সিরাজ। ভাল।

হরেন। আজ আমাদের অভিনয়, সিরাজ।

সিরাজ। জানি।

হরেন। তুই তো অভিনয় করতে পারলি না, আমিই নামছি সিরাজের ভূমিকায়।

বিমল। হেড স্যার বলেছিল পূজার ছুটির আগে আবার একদিন অভিনয় হবে, তুই তখন সিরাজের ভূমিকায় নামবি।

সিরাজ। সে তো অনেক দেরী। আজ তো আমি দেখতেও পাব না। ডাক্তার বসতেও বারন করেছে।

মা। তোর শরীর যে বড় দুর্বল বাবা। এখন পরিশ্রম করা তো তোর সইবে না।

সিরাজ। তোদের অভিনয় কখন সুরু হবে?

বিমল। সন্ধ্যার পরেই। হেডস্যার বলেছেন ঠিক সাতটায় সুরু হয়ে যাবে। মোটেই দেরী হবে না।

সিরাজ। তোরা জোরে বললে আমি এখান থেকেই শুয়ে শুয়ে শুনতে পাব, যদি এদিকে হাওয়া বয়।

হরেন। কাল আমরা এসে বলবো'খন, কার কেমন হোল।

বিমল। এখন আমরা যাই ভাই। আবার মেক-আপ করার সময় চাই।

[সকলে বেরিয়ে গেল]

সিরাজ। [আপন মনেই বিড় বিড় করে বলে উঠলো] মীরজাফর, তোমার প্রাণাধিক পুত্র মীরাণের মাথায় হাত রেখে তুমি শপথ করেছিলে, তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার পায়ের কাছে আমি আমার রাজমুকুট নামিয়ে দিয়েছিলাম, মুসলমান হয়ে তুমি তোমার শপথ রক্ষা করলে না। রাজার মুকুট দু'পায়ে দলে দিয়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতা তুমি বিলিয়ে দিলে এক বিদেশীর চরণে—মীরজাফর-বিশ্বাসঘাতক-বেইমান!

মা। কি বলছিস বাবা?

সিরাজ। আমার নাটকের কয়েকটা লাইন মনে পড়লো মা, তাই বলছি।

মা। ওসব কথা এখন মনে আনিস না বাবা। চুপ করে থাকিস্ ঘুমো। উত্তেজনা হলে জ্বর বাড়বে।

সিরাজ। না মা, আমি চুপ করেই আছি। কিন্তু মা—

মা। কি বাবা?

সিরাজ। আমার নাটক, আজ প্রথম অভিনয়, আমি দেখতে পেলাম না।

মা। তুই সেরে ওঠ, আবার তো একদিন অভিনয় হবে। তখন তুইও তো অভিনয় করবি।

সিরাজ। আচ্ছা মা, তুমি যাও না, তুমি দেখে এসে আমায় সব বলবে।

মা। এখানে তোর কাছে কে থাকবে বাবা?

সিরাজ। ঘণ্টাখানেক তো মাত্র—

মা। না বাবা, তোর সঙ্গে একসঙ্গেই দেখবো। সেই বেশ হবে।

সিরাজ। তাহলে জানালাটা খুলে দাও মা।

মা। হিম লাগবে যে বাবা।

সিরাজ। ওই জানালা দিয়ে ওদের আলোগুলো দেখতে পাব। এদিকে হাওয়া বইলে ওদের গলায় আওয়াজও শোনা যাবে।

মা। [জানালা খুলে দিলেন] হিমটুকুর ভয় করে বাবা।

সিরাজ। একটু তাকিয়ে দেখি, তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লে জানালাটা বন্ধ করে দিও। তুমিও এইখানে বসো, তুমিও শুনতে পাবে।

[মা জানালার ধারে বসলেন।
সিরাজ তাকিয়ে রইল জানালা-পানে।
বাইরে থেকে অস্ফুট কোলাহল শোনা গেল।]

পঞ্চম দৃশ্য

মঞ্চের উপর অভিনয় হচ্ছে।

নেপথ্যে মুহুর্মুহু কামানের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

মীরজাফর [illegible] মঞ্চে উপর পদচারণা করছেন।

মীরণ প্রবেশ করলো।

মীরজাফর। কি সংবাদ?

মীরণ। মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছে।

মীরজাফর। সুসংবাদ। আর চিন্তার কারণ নেই। সিরাজের পরাজয় এবার অবশ্যম্ভাবী।

মীরণ। তারপর?

মীরজাফর। তারপর বাংলা বিহার উড়িষ্যার মসনদে বসবে মীরজাফর—নবাব মীরজাফর—

মীরণ। কিন্তু কর্ণেল ক্লাইভ—

মীরজাফর। ক্লাইভকে আমি টাকা দিয়ে কিনেছি।

মীরণ। আপনি নবাব মীরজাফর, আমি নবাবজাদা মীরণ।

[বেগে সিরাজদ্দৌলার প্রবেশ]

সিরাজদ্দৌলা। মীরজাফর, তোমার প্রাণাধিক পুত্র মীরণের মাথায় হাত রেখে তুমি শপথ করেছিলে। তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার পায়ের কাছে আমি রাজমুকুট নামিয়ে দিয়েছিলাম। মুসলমান হয়ে তুমি তোমার শপথ রক্ষা করলে না? বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতা রক্ষা করার আজ আর কেউ রইল না।

মীরজাফর। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন নবাব।

সিরাজদ্দৌলা। তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম সেনাপতি, সে বিশ্বাস তুমি রাখতে পারনি।

[বাইরে কোলাহল। জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।]

সৈনিক। জাঁহাপনা

সিরাজদ্দৌলা। [illegible]বাদ?

সৈনিক। আমরা হেরে গেছি জাঁহাপনা, সব পালাচ্ছে—

সিরাজদ্দৌলা। মীরজাফর—